দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিচিতি
(সূচনাপর্ব — বিশ শতকের প্রথমার্ধ)

ভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের বাসনা থেকেই সাহিত্যের সূচনা। তাই দেখা যায়, লিখিতরূপ পাবার আগে যে কোনো ভাষার যে কোনো সাহিত্যের প্রথম বিকাশ ঘটে মৌখিকরূপেই। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত ছড়ায়, মেয়েলি ছড়ায় ও রূপকথা-উপকথার গল্পগাথায় বাংলা শিশুসাহিত্যের উন্মেষ ঘটে। আমরা জানি, মানুষের ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় রূপকথার জন্ম। সৃষ্টিলগ্ন থেকে প্রকৃতি-পরিবেশের নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ ক্রমাগত সামাজিক বন্ধনে নিজেদের বেঁধেছে। সভ্যতার ভিত প্রস্তুত করেছে এবং নিজেদের বিস্তৃত করেছে। এইরকম সময়ে রূপকথার বিকাশ ও বিস্তৃতি। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> "মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই। ..... পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনীগুলি আজ অবলুপ্ত। ..... রূপকথার পরিপুষ্টি ঘটল মানবেতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই সময় মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে, শহর গড়ে তুলেছে, সভ্যতার মধ্যে পদক্ষেপ করছে। এ আর তার আত্মরক্ষার যুগ নয় — এ হল তার আত্মবিস্তারের পর্যায়। এখন আর বল্গা হরিণের ক্ষিপ্রগতির উপর আশ্রয় ক'রে প্রাণপণে সে পালাতে চেষ্টা করে না — তার আততায়ীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়; ড্রাগনের আগুন-ঝরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস, দৈত্যের লোহার মুগুর, ডাইনির মন্ত্রতন্ত্র, সাপের ফণা — সব কিছুকে তুচ্ছ করেই তার অপ্রতিহত অভিযান। নব নব দেশ জয় করে সে — লাভ করে নতুন ঐশ্বর্য, আর লাভ করে তার স্বপ্ন-কামনার রূপমূর্তি বন্দিনী রাজকন্যাকে। সে রাজকন্যা কখনো সোনালী চুলের রাশ এলিয়ে দেয় জানলা দিয়ে — তাই আশ্রয় করে রাজকুমার তার কাছে উঠে আসবে বলে; কখনো সে জীয়ন কাঠি মরণ কাঠির পাহারায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে; কখনো এক বিশাল দৈত্য কোনো অন্ধকার দুর্গের বন্ধ দুয়ারের সামনে পথ আগলায়, কখনো বা নাগপাশে এলিয়ে থাকে রাজকন্যা — রাজপুত্র দৈব-খড়্গ আর অজগরের মাথার মণি এনে তাকে মুক্তি দেবে।
>
> রূপকথার এই সমস্ত গল্প মানুষের জয় এবং জয়েচ্ছার সংকেত বহন করে। তাকে যে-কোনো উপায়ে আত্মরক্ষারই উপদেশ দেয় না — দুর্লভ্যের অভিযানে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য অনুপ্রাণিতও করে। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটেছে এই সব রূপকথায়। ....

184079

22 AUG 2006

রূপকথার ধারা অবশ্য আজও বয়ে চলেছে — কিন্তু এখন তার স্থান শিশু জগতে। তবু এই সমস্ত শিশুপাঠ্য কাহিনীর অন্তরালে মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের গভীর তত্ত্বটি সন্নিহিত।"[১]

বলা যায়, নিজেকে জানবার এবং জানাবার আনন্দময় অনুভূতি থেকে এই সমস্ত লোককথা-রূপকথার সৃষ্টি করেছে মানুষ। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, বীর রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, ঘুমন্ত রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্ষস — এ সবই তার মনোজগতে লাভ করেছে এক চিরন্তন বাস্তবরূপ। প্রকৃতপক্ষে রূপকথার কাহিনিতে আপাতদৃষ্টিতে যে রাজপুত্র-রাজকন্যা, দৈত্য-দানো, যাদুকাঠির ছোঁয়া প্রভৃতি অপরূপ অনুষঙ্গের দেখা মেলে, তার গভীরে বা ছদ্মবেশের আড়ালে রয়েছে বাস্তব জগতেরই প্রতিচ্ছবি। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯২-১৯৭০) মতে,

"এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব মনের আদিম, সনাতন নীতিরই আধিপত্য।"[২]

তাই দেখা যায়, মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, রীতি-নীতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সৃষ্ট-প্রচলিত লোককথায়, রূপকথায়। সেখানে দুঃখ-দারিদ্র্য-যন্ত্রণাময় জীবন থেকে সুখ-সম্পদ-সৌন্দর্যের জগতে যাত্রা; সত্যের জয়-মিথ্যার পরাজয় প্রভৃতি চিরপরিচিত ঘটনাধারাই নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে।

এছাড়াও রয়েছে জাতক কাহিনি, রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনি-উপকাহিনি, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর-এর নীতিনির্ভর গল্পকাহিনি। অবশ্য এসমস্ত রচনাগুলি সবক্ষেত্রে শিশুর উপভোগ্য নয়। শিশুদের কথা ভেবে এগুলি লেখা হয় নি। তবে শিশুসাহিত্যিক ও আলোচক আশা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৫-১৯৮৭)-এর ধারণা ঃ

"শিশুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া যদি কিছু দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহা পণ্ডিত বিষ্ণু শর্ম্মার "পঞ্চ-তন্ত্র"।.... পঞ্চ-তন্ত্র জীবজন্তু ও মানুষের জীবনকে আশ্রয় করিয়া একাধারে আনন্দ ও উপদেশ পরিবেষণ করিয়াছে।"[৩]

এগুলির মধ্যে রূপকথার রহস্য-রোমাঞ্চভরা গল্পগুলি ছোটদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। শিশুমন স্বভাবতই চঞ্চল ও কল্পনাপ্রবণ। রূপকথার গল্পে তারা খুঁজে পায় কল্পনার এক আশ্চর্য জগৎ। বিচিত্র চিত্রময় নানা ঘটনা তাকে আলোড়িত করে। রূপকথার অপরূপ যাদুকাঠির স্পর্শ তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। দুষ্ট রাক্ষসের পরাজয় আর বীর রাজপুত্রের জয় তার মনে ভালোমন্দের বোধ তৈরি করে। অবশ্য ছোটরা গল্পগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের অনুসন্ধান করে না। তারা শুধু গল্পের নির্মল মজাটুকু, আনন্দরসটুকু ছেঁকে নেয়। আর সেখানেই গল্পগুলির চরম ও পরম সার্থকতা।

আমরা লক্ষ করি, লোক-মুখে সৃষ্ট বিভিন্ন লোককথা-রূপকথার গল্পগুলি লোকের মুখে মুখেই দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। হয়তো এই কারণেই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত 'Folk-tale'-এর মধ্যে বিষয়গত, ভাবগত নানা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় মনে হয়, একই গল্প যেন স্থানভেদে সামান্য তারতম্য লাভ করেছে। তাই বাংলায় প্রচলিত অনেক লোকগল্প বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শোনা যায়। আবার ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে অন্যান্য ভাষাতেও কিছু কিছু একই ধরনের গল্পের প্রচলন আছে। আসলে ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ-প্রতিবেশের ভেদে কিছুটা আপাত পার্থক্য থাকলেও তার আন্তর-স্বভাবটির সামঞ্জস্য অস্বীকার করার উপায় নেই। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, এই লোককাহিনিগুলি ঈষৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরে প্রচারিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ কাহিনির অন্তর্কাঠামোটি থাকে অপরিবর্তিত (Constant)। আর তার কাহিনি-ঘটনা-চরিত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট গল্পের বাইরের অবয়বটি হয়ে থাকে পরিবর্তনীয় (Variable)।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারি। দেখা যায়, একটি গল্প, তার উৎসভূমি যেখানেই হোক না কেন, তা বাংলাদেশে এবং আর্মানি দেশে প্রায় একই ভাবে-ভঙ্গিতে প্রচলিত। বাংলায় গল্পটি এরকম —

> "এক রাখাল ছেলে আর তার মা থাকত। রাখাল রাজার বাড়ি গোরু চরাত। সকালে এসে সে গোরু নিয়ে যেত আর সন্ধ্যার আগে সে গোরু গোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে ভাত খেত। একদিন কোন এক পর্ব উপলক্ষে রাজা তাঁর সব লোকজনকে পিঠে খাওয়ালেন। রাখাল হাজির ছিল না বলে বাদ গেল। পরের দিন সে রাজার কাছে অনুযোগ করলে যে, সে গত দিন পিঠে খেতে পায় নি। শুনে রাজা দুঃখিত হলেন। তাঁর ভাঁড়ারিদের হুকুম দিলেন, রাখালদের বাড়িতে উপযুক্ত পরিমাণ চাল ডাল তেল ও গুড় পাঠিয়ে দিতে, যাতে তারা প্রচুর পিঠে গড়ে খেতে পারে। ভাঁড়ারি তাই করলে। সে-সব জিনিস পেয়ে রাখালের মা খুব খুশি হয়ে রাত্রিতে পিঠে গড়লে। সকালবেলা রাখাল কোঁচড়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে যথারীতি গোরু চরাতে গেল। মাঠে পৌঁছে গোরু ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় বসে রাখাল মনের আনন্দে পিঠে খেতে লাগল। খেতে খেতে একটা পিঠা ফস্‌কে মাটিতে পড়ে গেল। সেখানে একটা গর্ত ছিল, সেই গর্তের মধ্যে পড়ে পিঠেটা তলিয়ে গেল। রাখাল সেটাকে উদ্ধার করতে অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। তখন সে খুব রেগে গিয়ে গর্তের ধারে তার গোরু-তাড়ানো লাঠি ঠুকে শাসনের সুরে বললে যে, কাল এসে যদি সে পিঠে না পায়, তবে সে গর্ত খুঁড়ে যেমন করে হোক বার করবে। সন্ধ্যে হব-হব হতে সে গোরু নিয়ে চলে গেল।
>
> পরের দিন সেখানে এসে দেখে যে, সেই গর্তর কাছে একটা বড় গাছ রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে আর তার ডালে ডালে ফলের মতো পিঠে অজস্র ঝুলছে। গোরু চরতে দিয়ে রাখাল গাছে উঠল আর মনের আনন্দে গরম গরম পিঠে খেতে লাগল সেই সঙ্গে

ছড়াও কাটতে লাগল ঃ

কেমন মজার কল
পিঠে গাছের ফল
কেমন মজা ভাই
পেটটা ভরে খাই।

তখন সেখান দিয়ে এক ডাইনি রাক্ষসী যাচ্ছিল। সে রাখালের গাছতলায় এসে তার কাছে কাতরভাবে পিঠে চাইতে লাগল। রাখাল গাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে চাইলে কিন্তু ডাইনি তাতে রাজি হল না। বললে, তুমি নেমে এসে নিজে হাতে করে দাও। ডাইনির কথায় ভুলে রাখাল গাছ থেকে নেমে এল বুড়িকে পিঠে দিতে, আর বুড়ি অমনি তাকে ধরে জব্দ করে তার ঝুলিতে পুরে নিলে। তারপর ঝুলির মুখ এঁটে সে কাঁখে করে নিয়ে চলল তার বাড়ির দিকে। যেতে যেতে তার খুব তেষ্টা পেল। সে একটা পুকুর দেখে তার পাড়ে ঝুলি নামিয়ে জল খেতে গেল। ব্যাপার বুঝে রাখাল ঝুলির মধ্যে থেকে চেঁচাতে লাগল। কাছেই কয়েকজন ছেলে গোরু চরাচ্ছিল। তারা এসে ঝুলির মুখ খুলে দিয়ে রাখালকে মুক্ত করলে। রাখাল পালিয়ে গেল। ছেলেরা ঝুলির মধ্যে ইঁটপাটকেল ভরে দিয়ে ঝুলির মুখ বেঁধে দিলে। ডাইনি কিছুই জানে না। সে এসে ঝুলি কাঁখে করে বাড়ি গেল। বাড়িতে গিয়ে ঝুলির মুখ খুলে দেখলে যে রাখাল পালিয়েছে।

পরের দিন আবার বুড়ি এল। সেদিনও রাখাল পিঠে গাছে চড়ে পিঠে খাচ্ছে। সেদিনও রাখাল বুড়ির কথায় ভুলে তাকে পিঠে দিতে গাছ থেকে নামল। বুড়িও তাকে ধরে ঝুলিতে পুরলে। এবার বুড়ি পথে কোথাও না থেমে সটান বাড়ি এল। ঝুলি খুলতে রাখাল বেরিয়ে এল। বুড়ি তার বউকে বললে, রাখালকে কেটেকুটে ঝোল ও অম্বল রাঁধতে। এই বলে বুড়ি পাড়ার ডাইনি-রাক্ষসীদের নেমন্তন্ন করতে বেরোল। ডাইনির বউটা ভালো মানুষ দেখে রাখাল তাকে ভুলিয়ে কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি সব পরলে। তারপর সে ডাইনির বউ সেজে রয়েছে। তার বউকে কেটেকুটে রান্না চড়িয়ে দিলে। রান্না শেষ হতে না হতে ডাইনি রাক্ষসী ফিরে এল। কিন্তু সে বুঝতে পারলে না যে রাখাল তার বউ সেজে রয়েছে। তারা সব খেতে বসল। তারপর রাখাল স্নান করবার অছিলায় পালাল। নদী পেরোবার সময় সে চেঁচিয়ে বলে দিলে যে, সে নিজের বউয়ের মাংস খেয়েছে। অমনি ডাইনি দৌড়ালো তাকে ধরতে। কিন্তু ইতিমধ্যে রাখাল নদী পার। সে কিছুই করতে পারলে না।

আমানি গল্পটি এবার সংক্ষেপে বলি —

এক স্ত্রীলোকের ছিল একগাদা মেয়ে। তাদের নিয়ে সে সর্বদাই ঝঞ্ঝাট মানত। একদিন সে বিরক্ত হয়ে মেয়েগুলোকে উনুনের মধ্যে পুরে দিয়েছিল। তারা সব পুড়ে মরে যায়। তবে সবচেয়ে ছোট মেয়েটা সেদিন উনুনের পিছনে লুকিয়ে ছিল বলে পার

পেয়ে যায়। দুপুরবেলা হলে মায়ের খেয়াল হল মাঠে কর্তার খাবার পাঠাতে হবে। সেকথা সে মনের দুঃখে চেঁচিয়ে বলাতে ছোট মেয়ে উনুনের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে বললে, আমি যাব। সে তার বাবার খাবার নিয়ে মাঠে গেল। বাবা খাবার খেয়ে মেয়েকে বললেন, দূরে না গিয়ে কাছাকাছি থাকতে, আর নিকটে আপেল গাছ ছিল তার থেকে ফল পেড়ে না খেতে। আপেল গাছে পাকা আপেল ঝুলছে দেখে মেয়েটি বাপের কথা ভুলে গিয়ে আপেল পেড়ে নিয়ে খেতে লাগল। এমন সময় এক কানা বুড়ি — আসলে প্রেতিনী ডাইনি (werewolf or goblin) এসে মেয়েটির কাছে আপেল চাইলে। মেয়েটির মনে দয়া হল। সে যেই আপেল দিতে যাবে অমনি ডাইনি তাকে ধরে থলেতে পুরে নিলে। তারপর সে চলল নিজের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে মেয়েটি এক জলাশয়ের কাছে এসে থলের ভিতর থেকে বললে, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব। বুড়ির থামবার প্রয়োজন হয়েছিল। সে সেই জলাশয়ের ধারে থামল। মেয়েটিকে জল খেতে ছেড়ে দিলে। মেয়েটি থলে থেকে বেরিয়ে পালাল। তার আগে সে থলে ইঁটপাটকেলে ভরে দিয়েছিল। বাড়িতে এসে ডাইনি দেখলে যে মেয়েটা তাকে ঠকিয়েছে।

তারপর আবার একদিন এমনি ঘটনা ঘটল। সেবারেও এমনি করে মেয়েটি পালাতে পেরেছিল। তিনবারের বেলায় মেয়েটি আর পালাতে পারলে না। থলি থেকে মেয়েটিকে বার করে দিয়ে ডাইনি তার বউকে বললে ওকে কেটেকুটে রান্না করতে। বাংলা গল্পের মতোই এখানে মেয়েটি ডাইনির বউকে কেটেকুটে রান্না করলে, বুড়িকে খেতে দিলে। ডাইনি যখন খাচ্ছে তখন মেয়েটি ঘরের মাচায় উঠে চেঁচিয়ে বললে, 'তোর বউয়ের মাংস খাচ্ছিস'। ডাইনি রেগে দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে গেল। কানা সে, মেয়েটাকে ধরতে পারছে না। সে বললে, 'কোথায় তুই?' মেয়েটি বললে, 'আমি মাচায়'। ডাইনি মাচায় উঠতে গিয়ে খোঁচাখুচি খেয়ে পড়ে মরে গেল। মেয়েটি পালিয়ে গেল।"[৪]

আমরা লক্ষ করি, প্রাচীন রূপকথা, লোককথা, উপকথা — যা সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে, সেগুলির মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য আছে। হয়তো নাবিক, বণিক, পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে গল্পগুলি দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে এবং মূল কাহিনিটি নানা সময়ে নানা দেশের উপযোগী হয়ে উঠেছে। ড: মানস মজুমদার এক পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন, রূপান্তরিত রূপকথার অজস্র নিদর্শন রয়েছে আমাদের চারপাশে। তাঁর মতে,

> "বাংলার 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পের প্রায় ৭৭০টি রূপান্তর দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।
>
> দক্ষিণারঞ্জন সংগৃহীত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'সাত ভাই চম্পা' গল্পটির নানা রূপান্তর চোখে পড়ে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও। যেমন ফিনল্যাণ্ডে ৭৩টি, ইটালীতে ৭০টি, রাশিয়ায় ৬৩টি, আমেরিকায় ৫৫টি, সুইডেনে ২৮টি, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৭টি, জার্মান ভাষায় ২৫টি, রুমানিয়ায় ২২টি,

এষ্টোনিয়ায় ২২টি, ফরাসী ভাষায় ২০টি, হাঙ্গেরীতে ১৭টি, আফ্রিকায় ১০টি কথান্তর পাওয়া যায় এ গল্পের। কথান্তর পাওয়া যায় আরো অনেক দেশে, আরো অনেক ভাষায়।

এ বিষয়ে সমস্ত গল্পকে টেক্কা দিয়েছে 'সিণ্ডেরেলা'র গল্পটি। এ গল্পের হাজার হাজার রূপান্তর তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে।"[৫]

আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ গল্পকাহিনির খনিগর্ভ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। এদেশ জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, দশকুমারচরিত-এর সৃষ্টিক্ষেত্র। বিশ্বের বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকগণ একমত হয়েছেন যে, এই ভারতভূমি থেকেই বিশিষ্ট গল্প-কাহিনি পৃথিবীর মানুষ পেয়েছেন। ফেড্রিক ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০), থিওডোর বেন্‌ফি (?) প্রমুখ এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েছেন যে, ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশ নেই যে দেশের লোকজীবন থেকে এত বিচিত্র গল্পকাহিনি পাওয়া যেতে পারে।

দেখা যায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত লোকসাহিত্যের মধ্যেই শিশুসাহিত্যের বীজটি সংগুপ্ত ছিল। তবে লোকসাহিত্যের বিশেষ কিছু ছড়া ও গল্প শিশুদের উপযোগী হলেও তার সবটুকু শিশুসাহিত্য নয়। আসলে সুবিস্তৃত লোকসাহিত্যের তথা রূপকথা-উপকথা-ছড়ার একটা বিশিষ্ট অংশ চলে এসেছে শিশুমহলে, আর অনেকটাই চলে গেছে বড়দের সাহিত্যক্ষেত্রে। 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এস' বা 'আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা' প্রভৃতি লোকায়ত ছড়ায় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রথম গুঞ্জরণ শোনা যায়। সমস্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগ ছিল এই মৌখিক ছড়ার বিশাল পটভূমি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রূপকথার পাশাপাশি এই ছড়াগুলিও মৌখিকরূপেই প্রচলিত ছিল। লোকজীবনের প্রাত্যহিক নানা ঘটনা, সাধারণ মানুষের আন্তরিক চাওয়া-পাওয়া, আশা-ভালোবাসা, হাসি-কান্না --- এসবই প্রতিফলিত হয়েছে সেই সমস্ত লোকজ ছড়ায়। লক্ষ করা যায়, মানুষের জীবনের এক অনিবার্য অঙ্গরূপে সেখানে শিশুর চঞ্চল চপল উপস্থিতি। তাই বোধহয় সেকালে মা-ঠাকুমাদের মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছে শিশুমন ভুলানোর ছড়া, ছেলেখেলার ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া প্রভৃতি।

ছেলেভুলানো ছড়াগুলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর প্রায় সবদেশে এই মৌখিক অনাধুনিক ছড়ার ছন্দরীতি ও প্রকৃতি প্রায় এক। এর প্রধান কারণ বোধহয় স্থান-কাল, বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বময় শিশুচরিত্রের একরূপতা। এপ্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) অভিমত —

"বয়স্ক মানবের চরিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ। প্রাকৃতিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা দেশভেদে ও কালভেদে মানবচরিত্রের স্বাভাবিক কাঠামটাকে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া তাহার উপর পালিশ দিয়া রঙ্ ফলাইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রদান করে; কিন্তু শিশু-চরিত্র বোধ করি সর্ব্বদেশেই ও সর্ব্বকালেই একরূপ।"[৬]

--- তাই দেখা যায়, দেশ-বিদেশের শিশুদের জন্য তৈরি ছড়ায় বিষয়গত, প্রকরণগত বৈচিত্র্য থাকলেও তার

চরিত্রগত মিল অনেক। "পৃথিবীব্যাপী সমস্ত শিশুর সুর ও ছন্দানুভূতি সম্পূর্ণ এক।"[৭] অবশ্য বাংলার মা-ঠাকুমার রচিত ছড়ায় একটা স্বভাবগত স্বাতন্ত্র্য বারবার চোখে পড়ে। এই সমস্ত রচনায় বাংলাদেশ, বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, বাঙালি গৃহস্থের একটা সহজ স্বচ্ছ ছবি ভেসে ওঠে। যার আবেদন ও আকর্ষণ চিরকালীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মতে,

> "এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।"[৮]

— এই চিরন্তনতা আছে বলেই প্রাচীন ছেলেভুলানো ছড়াগুলি আজও বাংলার শিশুদের কাছে সমান চিত্তাকর্ষক হয়ে আছে। ধরা যাক,

> "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ।
> শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।" ['টাপুর টুপুর', খুকুমণির ছড়া, পৃ: ১২০]

অথবা,

> "চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে
> কদম তলায় কে?
> হাতী নাচ্‌বে, ঘোড়া নাচ্‌বে
> সোনামণির বে।" ['সোনামণির বে', ঐ, পৃ: ২৪০]

— প্রভৃতি ছড়াগুলির কথা। যেখানে চিরকালের শিশুরা খুঁজে পায় তার নিজের জগতের ছবি। তার মনের খোরাক। অবশ্য সময়ের প্রবহমানতায় মানুষের স্মৃতিপটে লালিত এই সমস্ত ছড়াগুলি অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন ও ভিন্নতা লাভ করেছে। তবে এই বিবর্তনের ধারায় তাদের আকর্ষণ ও আবেদন কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।

এইভাবেই আপন বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে প্রাচীন লোকজ সাহিত্যধারা যুগ যুগ ধরে বাঙালির শৈশবকে মাতিয়ে রেখেছে। তবে কে বা কারা এইসমস্ত ছড়া-গল্পকথার রচয়িতা তা আমরা জানতে পারি না, জানতে পারি না রচনাগুলির সাল-তারিখও। জন্মলগ্ন থেকে মানুষের মুখে মুখেই এগুলি প্রবাহিত হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে সৎ-পরিশ্রমী-সাহিত্যপ্রেমী কিছু মানুষের প্রচেষ্টায় এই মৌখিক রচনাগুলি লিখিত সাহিত্যের রূপ ও মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলা শিশুসাহিত্যের আদি উৎসরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মৌখিক সাহিত্যরীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। ক্রমে মুদ্রণশিল্পের বিকাশের সাথে সাথে স্মৃতিপটে লালিত মৌখিক সাহিত্য পায় এক প্রাণময় লিখিত অবয়ব। বলা যেতে পারে বাংলায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত প্রকাশ ঘটে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ** (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মে) প্রতিষ্ঠা করে বাংলা গদ্য সাহিত্যচর্চার পটভূমি নির্মাণ করেন। এই কলেজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এখানে ছোটদের পাঠ্য বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই অনুবাদ। দু'একটি লোকজ উৎস থেকে গৃহীত। রচনাগুলির

মূল অভিপ্রায় ছিল ছোটদের মনে নীতিবোধ ও আদর্শবোধ জাগ্রত করা। এই পর্বে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হ'ল — **বত্রিশ সিংহাসন** (১৮০২), **ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট** (১৮০৩), **তোতা ইতিহাস** (১৮০৫), **হিতোপদেশ** (১৮০৮), **ইতিহাসমালা** (১৮১২), **প্রবোধ চন্দ্রিকা** (১৮৩৩) প্রভৃতি।

এগুলির মধ্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের** (১৭৬২-১৮১৯) রচনা। সংস্কৃত 'বত্রিশ সিংহাসন' গ্রন্থের অনুবাদ। 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' **তারিণীচরণ মিত্রের** (আনুমানিক ১৭৭২-১৮৩৭) রচনা। ইংরেজি 'The Oriental Fabulist' গ্রন্থের অনুবাদ। 'তোতা ইতিহাস' গ্রন্থের মূল উৎস ফারসি 'তুতিনামা' গ্রন্থটি। **চণ্ডীচরণ মুন্সী** (১৭৬০?-১৮০৮) এই বইটির রচয়িতা। মৃত্যুঞ্জয় অনূদিত 'হিতোপদেশ'-এর কাহিনি সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র থেকে গৃহীত। অন্যদিকে **উইলিয়াম কেরীর** (১৭৬১-১৮৩৪) 'ইতিহাসমালা' ও মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' গ্রন্থ দু'টিই এদেশীয় লোকজ উৎস থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। এগুলির ভাষা কিছুটা আড়ষ্ট হলেও গল্পকাহিনির মানবিকরস আস্বাদনযোগ্য। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের কঠিন শৃঙ্খলে রচনাগুলি সীমায়িত থাকেনি, এক অপূর্ব সাহিত্যরসের আভাস বা ইঙ্গিত এখানে ধরা পড়েছে।

১৮১৭-১৮ খ্রিষ্টাব্দ বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই প্রতিষ্ঠা হয় **'দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'**। যদিও ছোটদের উপযোগী সাহিত্য রচনার পরিকল্পনা নিয়ে এই সোসাইটির বইপত্র প্রকাশিত হয় নি। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে এই সমস্ত বই প্রকাশ করে। তবে এই সময় এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বহু বালকপাঠ্য বই প্রকাশ পায়। এই রচনাগুলির সবই ছিল নীতিনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক পাঠ্যপুস্তকধর্মী রচনা। এগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল 'নীতিকথা' (১৮১৮)। তিন ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থে বর্ণপরিচয়, উপদেশ, নীতিকথাধর্মী গল্প-প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ইংরেজি ও আরবি নীতিকথার গল্প থেকে অনূদিত মোট ৩১টি কাহিনি স্থান পায় এখানে। **তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন** — এই তিনজন লেখক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই সময়েই **শ্রীরামপুর মিশনের** (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি) উদ্যোগে প্রকাশ পায় 'দিগদর্শন' (১৮১৮) নামক একখানি মাসিক পত্রিকা। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৮৯৬-১৯৭৮) মতে, এটিই 'বাংলার প্রথম কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা'।[৪] **জন ক্লার্ক মার্শম্যান** ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। ভূগোল, ইতিহাস, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ রচনা এখানে স্থান পায়। জানা যায়, সে সময় বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্যপুস্তকের মতোই 'দিগদর্শন' পড়ানো হ'ত। আবার ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশ পায় বাংলা শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা **'পশ্বাবলী'**। পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন **জন লসন**। এখানে প্রতি মাসে একটি করে জীবজন্তুর ছবিসহ বিবরণ প্রকাশ পেত। অনেকটা গল্পচ্ছলে ছোটদের মনে প্রাণীজগৎ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস এখানে দেখা যায়। সাময়িক পত্র হ'লেও বিষয়গত অভিনবত্বে ও চিত্রময়তায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রটি বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে সে সময় একের পর এক ছোটদের উপযোগী স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ পেতে থাকে। 'নীতিকথা'র ঠিক পরের বছরই প্রকাশ পায় 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯)। **তারাচাঁদ দত্ত** এই

গ্রন্থটির রচয়িতা। এরপর ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায় 'হিতোপদেশ'। **শ্রীরামকমল সেন** এবং শ্রীরামপুরের পাঠশালায় নিবন্ধকর্তাদের সংগৃহীত বিভিন্ন হিতোপদেশমূলক গল্প এখানে একসাথে স্থান পায়। এই ধরনের নীতি বা উপদেশধর্মী গল্প-কাহিনির পাশাপাশি সোসাইটি থেকে প্রকাশ পায় **রাধাকান্ত দেবের** 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১)। এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেকালের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সোসাইটির পরিচালক সমিতিতে ছিলেন উইলিয়াম কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে সোসাইটির তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত বই প্রকাশ পায়, সেগুলিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় করার দিকে লেখকদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যদিও বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রথমদিকের রচনা বলে এখানে তেমন সাহিত্যরস ও শিল্পগুণ লক্ষ করা যায় না। তবে বাংলা শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রারম্ভলগ্নে স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা ও অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, পরবর্তী কালে বাংলা শিশুসাহিত্যের যে প্রাঞ্জল সরস ধারা আমাদের চোখে পড়ে তার সূচনা ঘটে এখানেই।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)

বাংলা শিশুসাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক কোনো কিছু আলোচনা করতে গেলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথা প্রথমেই বলা দরকার। তিনি হচ্ছেন শিশুসাহিত্যের আদি গঙ্গার ভগীরথ। তাঁকে তাই যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বলতে হয় যে, তিনি একাধারে আমাদের বর্ণপরিচয় তথা শিশু-শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা এবং শিশুসাহিত্যের সংগঠক। তাঁর সংগঠকসত্তা আমাদের শিশুসাহিত্যকে রসময় করে তুলেছে। বিদ্যাসাগরের আগে একমাত্র ব্যক্তি হলেন মদনমোহন, যাঁর 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ পায় ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে। মদনমোহন ছিলেন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক। একইসঙ্গে বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন বিনা বেতনে। এই স্কুলে বাংলা শেখাবার জন্য তিনি একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এটিই 'শিশুশিক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়। বইটির আখ্যা-পত্রে লেখা ছিল, 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ'। এই বইটি রচনার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'শিশুশিক্ষা'র দেড়শো বছর' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় —

> ''শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগটির সঙ্গে 'মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত জে.ই.ডি. বীটন'-এর 'সুপ্রতিষ্ঠিত নাম সংযোজন' বিষয়ে একটি নিবেদন আছে। সেখানে এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মদনমোহন লিখেছেন ঃ 'অনেকেই অবগত আছেন, প্রথমপাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথা নিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম''।[১০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিশুদের, বিশেষ করে, 'বালিকা'দের যথাযথভাবে বাংলা ভাষা শেখাবার উদ্দেশ্যে মদনমোহন এমন একখানি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই ধারাবাহিকতায় ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায় শিশুশিক্ষার

তৃতীয় ভাগ 'ঋজুপাঠ'। গ্রন্থটির মুখবন্ধে রয়েছে — 'শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানা বিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল'। এই শিশুশিক্ষা বইটির চতুর্থ ভাগের লেখক বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বইটি 'বোধোদয়' নামে পরিচিত।

মদনমোহনের পাঠ-পরিকল্পনায় ও শব্দ-সংযোজনায় ছিল অসাধারণ সারল্য ও গীতিময় আবেদন। সেই পাঠে ছন্দের দোলা শিশুমনকে আন্দোলিত করত। যেমন, 'পান খায়, গান গায়। শীত পায়, গীত গায়। কূপ জল, রূপ বল। খৈ খাই, দৈ নাই'। আবার 'বার তিথি মাস যত।/একে একে হয় গত।/বার মাস সাত বার।/আসে যায় বার বার।/লেখাপড়া করে যেই।/গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' — সেই বিখ্যাত পংক্তিগুলি এখানেই লিপিবদ্ধ। এই গ্রন্থেরই অপর একটি বিখ্যাত কবিতা হল — 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।/ কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।' 'শিশুশিক্ষা' বইটিতে বর্ণপরিচয়, যুক্তাক্ষর সম্পর্কে ধারণা এবং ছন্দের দোলা ছাড়াও শিশুমনের উপযোগী সুপরিকল্পিত বিষয়, কাহিনি ও চরিত্র সৃজন করেছেন লেখক। যেমন, দুরন্ত বালক বেণীর কথা, গোপালের কথা, মাধবের সদ্ব্যবহার, চুরি করা বড় দোষ, কুকুর সিংহ হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিষয় ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে কোথাও কোথাও ছোট ছোট কাহিনির ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং শিশুমনের গঠনে আবেদন সৃষ্টি করেছেন। এইসব অংশে সংগঠক মদনমোহন শিশুসাহিত্যের সৃজনশীল মদনমোহনে পরিণত হয়েছেন। কারণ তিনি পাঠ্যপুস্তককে একান্তই নীরস পাঠ্যক্রম করে তোলেন নি। তাঁর রচিত পাঠের বিষয়গুলি গল্পের রসে সিক্ত হয়ে শিশুমনের নিকট আদরণীয় এবং আকর্ষণীয় হয়েছে। সেদিক থেকে বলা যায়, এই সব রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের তথা শিশুসাহিত্যের উদ্ভবপর্বের বিশিষ্ট নিদর্শন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

এরপর বাংলা সাহিত্যের জগতে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য বা শিশুসাহিত্যের জগতেই নয়, বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, জনরুচি প্রভৃতি সমস্ত কিছুর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁকে এই সাহিত্যধারার প্রথম সার্থক রূপকার হিসেবে অভিহিত করা যায়। তিনিই প্রথম ছোটদের মানসিকতার ও চরিত্রের উপযোগী সুন্দর গল্পরসযুক্ত সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। যদিও খুব সচেতনভাবে নিছক সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি উদ্যোগী হন নি। তাঁর রচনার মূল লক্ষ্য ছিল লোকহিত, লোকশিক্ষা ও সমাজসেবা। অবশ্য সুগভীর পাণ্ডিত্য, মানবতাবোধ ও সমাজভাবনা তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অসাধারণত্ব দান করেছে। এ প্রসঙ্গে 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থের রচয়িতা বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০)-এর অভিমত ঃ

> ''বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শও হিউম্যানিস্টের আদর্শ। তিনি নিজে ছিলেন 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যার সাধক, তাই তাঁর শিক্ষার আদর্শেরও ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজম্। ..... মানুষই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রেরণাকেন্দ্র। শাস্ত্রকার নয়, পুরোহিত নয়, গুরু নয়, পণ্ডিত নয়,

সবার উপরে 'মানুষ' গড়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। এই সর্বাঙ্গীণ মানবমুখিন শিক্ষানীতির প্রবর্তকরূপে বিদ্যাসাগর আজো শিক্ষাক্ষেত্রে 'একক' স্থান অধিকার ক'রে আছেন।"[১১]

বেশ কিছু অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন বিদ্যাসাগর। তবে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলিই মূলত ছোটদের উপযোগী। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল —

বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) — হিন্দি 'বৈতাল পচ্চীসী' থেকে গৃহীত।

জীবনচরিত (১৮৪৯) — ইংরেজি চেম্বার্সের 'Biographies' অবলম্বনে রচিত।

বোধোদয় (১৮৫১) — ইংরেজি চেম্বার্সের 'Rudiments of Knowledge' অবলম্বনে রচিত।

ঋজুপাঠ (১৮৫১-৫২) — সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহারের নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে রচিত।

কথামালা (১৮৫৬) — ইংরেজি 'Ishop's Fables' থেকে অনূদিত।

চরিতাবলী (১৮৫৬) — ইংরেজি জীবনীগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩) — ইংরেজি বিভিন্ন কাহিনির অনুবাদ।

লক্ষ করা যায়, এই সমস্ত গ্রন্থগুলি অনুবাদ হ'লেও বিদ্যাসাগরের রচনার গুণে যথার্থ মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ না করে তার ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই দেশি বা বিদেশি উৎসগুলির যে বিষয়বস্তু ছোটদের উপযোগী নয়, তাকে নির্দ্বিধায় বাদ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আসলে আমাদের সামাজিক রুচি, সংস্কার, শালীনতাবোধে যে বিষয়গুলি যথাযোগ্য নয়, সেগুলিকে গ্রহণ করেননি তিনি। ছোটদের মন, মনন ও চরিত্র গঠনে সহায়ক বিষয়গুলিকেই মূলত যত্নসহকারে তিনি তাঁর শিশুপাঠ্য বইগুলিতে স্থান দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ছোটদের উপযোগী সাহিত্যের স্বরূপ-সমস্যা বিষয়ে বিদ্যাসাগরই প্রথম চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন এবং নিজের সৃষ্টিক্ষেত্রে তার প্রয়োগও ঘটিয়েছিলেন। তাই ছোটদের সাহিত্যে অবাঞ্ছিত বিষয়, ভাষা, শব্দ বর্জন করে তিনি রুচিশীল বিষয়, সহজ ভাষা ও সরল শব্দ ব্যবহারে বেশি গুরুত্ব দেন। আমরা দেখতে পাই, 'বোধোদয়', 'ঋজুপাঠ', 'কথামালা', 'চরিতাবলী' প্রভৃতি রচনায় সহৃদয় সচেতন লেখক সেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। 'বোধোদয়'-এ ছোটদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের উপযোগী বিষয়, 'ঋজুপাঠ'-এ বিভিন্ন ভারতীয় পুরাণকথা, 'কথামালা'য় বিভিন্ন নীতিকথাধর্মী কাহিনি, 'চরিতাবলী'-তে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকথা স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভাষাশিক্ষা ও নৈতিকশিক্ষা দানের জন্য বিদ্যাসাগর দু'টি খণ্ডে রচনা করেন বর্ণপরিচয় (১৮৫৫)। যদিও এই বইটি শিশুসাহিত্য নয়, শিশুদের বর্ণের পরিচয় দানের এক উৎকৃষ্ট ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস। তবে 'বর্ণপরিচয়'-এর 'দ্বিতীয় ভাগ'-এর কিছু কিছু অংশে শিশুসাহিত্যের উপযুক্ত বিষয়, ভাব ও ভাষার পরিচয় মেলে। শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দ দানের উপযোগী বিষয়কে সরস

গল্প কাহিনির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর এখানে প্রকাশ করেছেন। তাই 'বর্ণপরিচয়'-এর 'প্রথম ভাগ'-এ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুষম প্রয়োগে 'জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, ফল ঝুলিতেছে' প্রভৃতির পরে লেখক বলেছেন গোপাল নামে এক ভালো ছেলে ও রাখাল নামে এক দুষ্টু ছেলের কাহিনি। তারপরেই দ্বিতীয় ভাগে পাই, সেই বিখ্যাত 'ভুবন ও মাসী'-র গল্প। এই গল্পে সহজভাবে তিনি ছোটদের মনের ভেতর একটা ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছেন, 'কদাচ চুরি করা উচিত নয়'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) গ্রন্থে 'বর্ণপরিচয়-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন —

> "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না — তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"[১২]

শিশুর অক্ষর পরিচয় থেকে শুরু করে তার নীতিজ্ঞান পর্যন্ত 'বর্ণপরিচয়ে'র আবেদন এমনই চিরন্তন। আসলে বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্ববর্তী শিশুপাঠ্যগ্রন্থ-রচয়িতা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পাঠক্রম অনুসরণে বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ের সংযোজন করেছেন। যে বিষয়গুলি নিতান্তই পাঠ্য বিষয় না হয়ে শিশুদের কাছে উপভোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। 'বেণী' বা 'মাধব'-এর গল্পের মতো তিনিও সৃষ্টি করেছেন 'নবীন', 'সুরেন্দ্র', মাধব', 'যাদব'-এর কাহিনি। সেইসব ছোট ছোট কাহিনি-অংশের মধ্য দিয়ে সমাজভাবনা, নৈতিক ভালোমন্দ বিষয়-বিবেচনা ও সুকুমারমতি ছোটদের অন্তরে মানবিক গুণের সঞ্চার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বিদ্যাসাগরই বাংলা সাহিত্যজগতে প্রথম ছোটদের জন্য লেখা রচনায় একাধারে শিক্ষা, সমাজচিন্তা, সাহিত্যবোধ ও আনন্দরসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক অপর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম পর্বের একজন যথার্থ রূপকার তিনি। বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি অমূল্য প্রবন্ধগ্রন্থ 'চারুপাঠ' (১৮৫২) তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। মূলত 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) পত্রিকার সম্পাদকরূপে ঐ পত্রিকার জন্য তিনি কয়েকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলি বড়দের জন্য লেখা হলেও ছোটরাও এর স্বাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হত। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধগুলিই অক্ষয়কুমারের সচিত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'চারুপাঠ' (তিনখণ্ড ঃ ১৮৫৩-৫৯)-এ প্রকাশ পায়। অবশ্য তখনও পর্যন্ত এই জাতীয় রচনা 'প্রবন্ধ' বা 'নিবন্ধ' নামে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। তাই অক্ষয়কুমার এই জাতীয় রচনাকে 'প্রস্তাব' নামে চিহ্নিত করেছেন। এই সমস্ত

রচনার মূল বিষয় ইংরেজি গ্রন্থ থেকে সংকলিত। তবে প্রকাশভঙ্গি ও আঙ্গিকের দিক থেকে লেখকের মৌলিকত্ব সুস্পষ্ট। শিশুসাহিত্যে এই প্রথম সমাজচিন্তা, স্বদেশচেতনা প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্বসহ স্থান পেল। আসলে অক্ষয়কুমার ছোটদের বাস্তবসচেতন ও সমাজসচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-স্বদেশের খুঁটিনাটি বিষয়কে তিনি সাহিত্যের সরস আঙ্গিকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বক্তব্য-বিষয়ের প্রকাশভঙ্গিতে এবং ভাষাচয়নে তিনি যথাসাধ্য সহজতা ও সাবলীলতা রক্ষা করে গেছেন। তাঁর 'চারুপাঠ' গ্রন্থটি সম্পর্কে আমরা কয়েকজন আলোচকের অভিমত এখানে উল্লেখ করছি ঃ

'চারুপাঠ' সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) মহাশয় লিখেছেন —

> "ইহার পূর্ব্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে কত নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থকার ইংরেজি গ্রন্থ হইতেই ঐ সকল বিষয় সংকলন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইংরেজির অনুবাদ।"[১৩]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯৬-১৯৭৮) এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "বিদ্যাসাগর-যুগে শিশু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'চারুপাঠ'। এমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-সাহিত্য শিশু-সাহিত্যে তখন ও পরবর্তীকালেও আর রচিত হয়নি।"[১৪]

শশিভূষণ দাশগুপ্তের (১৯১১-১৯৬৪) অভিমত —

> "তথ্য ও যুক্তিকে স্বল্পপরিসরের ভিতরে গুছাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের যে প্রথম পত্তন দেখিয়াছি দিগ্‌দর্শনের ভিতরে, এবং যাহার নমুনা পরে পাওয়া যায় 'স্কুলবুক সোসাইটি' প্রকাশিত কিছু কিছু পাঠ্য পুস্তকের ভিতরে এবং কতগুলি সাময়িকপত্রে, সেই জাতীয় প্রবন্ধ বাঙলা-সাহিত্যে একটা পরিণত রূপ লাভ করিয়াছিল অক্ষয়কুমারের হাতে তাঁহার তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'চারুপাঠে'র ভিতরে।"[১৫]

ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯২০-২০০৩) মতে —

> "অক্ষয়কুমার অনেকগুলি স্কুল পাঠ্যশ্রেণীর পুস্তিকা লিখেছিলেন। যথা- 'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারুপাঠ' (তিনখণ্ড, ১৮৫৩-৫৯), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬) গ্রন্থগুলি মূলতঃ বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে ছাত্রদের জন্য রচিত। সুতরাং সরলতা ভিন্ন এর আর বিশেষ কোন গুণ নেই। অবশ্য বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক নতুন তথ্যের সমাবেশ হওয়াতে শিক্ষাবিস্তারে এগুলির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।"[১৬]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধুমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সার্থক রূপকার নন, তিনি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতেও অভিনবত্বের দিশারী। লক্ষ করা যায়, তাঁর পূর্বে এবং সমকালে বাংলা শিশুসাহিত্য ছিল প্রধানত নীতিকথাধর্মী পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক রচনা। এই পর্বে অনেকেই নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী নীতিগর্ভ গদ্যপুস্তিকা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনই প্রথম সেই প্রচলিত গদ্য-মাধ্যমের পরিবর্তে সুন্দর উপভোগ্য কবিতার মাধ্যমে লিখলেন বেশ কিছু নীতিধর্মী কবিতা। বিখ্যাত ফরাসি কবি লা ফঁতেন্ (Jean de La Fontaine : 1621-1695)-এর 'Select Fables' (1776)-এর আদর্শে এগুলি রচিত। অনেকগুলি আবার লা ফঁতেন্-এর কিছুটা পরিবর্তিত ভাবানুবাদ। মধুকবির কয়েকটি কবিতার নাম ও উৎস এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হ'ল —

ময়ূর ও গৌরী	—	The Peacock complaining to Juno
কাক ও শৃগালী	—	The Raven and the Fox
রসাল ও স্বর্ণলতিকা	—	The Oak and the Reed
অশ্ব ও কুরঙ্গ	—	The Horse wishing to be revengent upon the stag
কুক্কুট ও মণি	—	The Cock and the Pearl
সিংহ ও মশক	—	The Lion and the Jnat

(মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, জুন ১৯৯৯ সংস্করণ থেকে নেওয়া হ'ল)

এছাড়াও রয়েছে 'দেবদৃষ্টি', 'গদা ও সদা', 'সূর্য ও মৈনাক-গিরি', 'মেঘ ও চাতক' প্রভৃতি কবিতাগুলি। এই সমস্ত নীতিগর্ভ কবিতার কয়েকটিকে সংগ্রহ করে **দীননাথ সান্যাল** প্রথম তাঁর সম্পাদিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)-তে প্রকাশ করেন। উল্লিখিত 'মধুসূদন রচনাবলী' সূত্রে জানা যায়, এই সমস্ত কবিতাগুলিকে একত্রিত করে একটি ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ করার পরিকল্পনা স্বয়ং মধুসূদনের মনে ছিল।

'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'সিংহ ও মশক', 'কাক ও শৃগালী' প্রভৃতি কবিতাগুলির মূল বিষয় মধুসূদন লা ফঁতেন্-এর ফেবলস্ থেকে নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এই গল্পগুলি ফরাসি ছাড়াও অন্যান্য দেশের নীতিকথাধর্মী গল্পকথায় নানাভাবে নানারূপে দেখা যায়। মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব তিনি এই সমস্ত রচনাগুলিকে আপন ভাববৈশিষ্ট্যে সিক্ত করে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর নীতিগর্ভ কবিতাগুলি প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে ও আভিজাত্যে একটা উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার রূপ লাভ করেছে। অনেকক্ষেত্রে সেগুলি ভাষায় ও ভঙ্গিতে ছোটদের বুদ্ধি ও উপলব্ধির সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। তবে কোথাও কোথাও নীতিকথার সরস উপস্থাপন প্রশংসার যোগ্য। আমরা এপ্রসঙ্গে দু'একটি কবিতার আলোচনা করতে পারি।

যেমন, 'গদা ও সদা' কবিতায় দেখা যায়, গদা ও সদা নামে দুই যুবক বনের পথ ধরে চলেছে দূর দেশে। পথে নানা বিপদের আশঙ্কায় দুজনে 'একপ্রাণ একমন' হবার সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু অচিরেই প্রচুর

সুবর্ণমুদ্রা লাভ করে সদা তার সংকল্প ভুলে যায়। বন্ধু গদাকে নানা কুকথা বলে তাকে তিরস্কার করে সে। এইভাবে পথ চলতে চলতে হঠাৎ একদল চোর তাদের আক্রমণ করে। সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় সদা কাতরকণ্ঠে গদাকে অনুরোধ জানায় —

"হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
এই ধন নিও পরে বাঁটি
তস্করদলের মাথা কাটি।"

কিন্তু গদা তার অনুনয়ে নরম হয় না, —

"কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।"

প্রচলিত নীতিকথাধর্মী গল্পের মতোই মধুসূদনও কবিতার শেষ পর্যায়ে কাহিনির মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন —

"আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে?" [মধুসূদন রচনাবলী, পৃ: ১৯১]

কবিতার সূচনা-অংশে আমরা দেখতে পাই, গল্প বলার স্বাভাবিক সাবলীল ভঙ্গিমা; "গদা সদা নামে/ কোন এক গ্রামে/ছিল দুই জন।/ দূর দেশে যাইতে হইল;/ দুজনে চলিল।" [ঐ, পৃ: ১৯০] — এই ভঙ্গিমা ছোটদের বড় প্রিয়, বড় আকর্ষণীয়। আবার বনপথের নানান ভয়াল জীবজন্তু, চোর-ডাকাতের দৃশ্যময় রূপকল্পও অসাধারণ। ছোটরা যেন তাদের কল্পনার ডানা মেলে সহজেই চলে যায় সেই প্রকৃতির মাঝে। অন্যদিকে গদা-সদার বন্ধুত্ব, লোভের বশবর্তী হয়ে সদানন্দের স্বার্থপরতা, বিপদ-মুহূর্তে তার বন্ধুত্বের মিথ্যে ছল এবং শেষপর্যন্ত সদাকে গদার উচিত শিক্ষাদান — এসবই যেন গল্পের স্বাভাবিক গতিময়তাকে আরো প্রাণদান করেছে। শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও এ কবিতার গল্পরস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়।

'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' মধুসূদন দত্তের এক বিশেষ ব্যতিক্রমী এবং জনপ্রিয় একটি কবিতা। এই কবিতায় কবি খুব সহজভাবে সরল ভাষায় রসাল ও স্বর্ণলতার রূপকে মানবসমাজে উচ্চ-নীচের যে ভেদাভেদ, তাকে ব্যক্ত করেছেন। আমাদের সমাজে যারা ধনে-মানে কুলে-শীলে উঁচু, তারা অন্যদের প্রতিনিয়ত অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে। কবি এখানে রসালের মধ্য দিয়ে সেই আত্মসর্বস্ব, অহংকারী মানবজাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কবিতার প্রথম পর্বে দেখা যায়, রসাল স্বর্ণলতিকার দীন হীন ক্ষুদ্রকায়া দেখে বিদ্রূপ করেছে এবং আপন বিশালতার কথা প্রচার করেছে। এই দুই ভিন্ন শ্রেণীর অবস্থানগত তারতম্য কবি প্রকাশ করেছেন অপূর্ব ভাষায় ও ভাবে; রসাল স্বর্ণলতিকাকে বলেছে — "মলয় বহিলে, হায়,/নতশিরা তুমি তায়,/মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া;/ হিমাদ্রি সদৃশ আমি,/বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,/মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!" [ঐ, পৃ: ১৮৮] যদিও কবিতার শেষের দিকে রসালের সমস্ত অহংকার একটি মাত্র ঝড়ের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 'অহংকারই যে পতনের মূল'—এই তত্ত্বকথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে অপূর্ব

গল্পরসের আশ্রয়ে। কবিতার শেষ চরণগুলিতে কবি সেই শাশ্বতবাণীই যেন ঘোষণা করেছেন —

"ঊর্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!" [ঐ, পৃ: ১৮৮]

অনুরূপভাবে 'সিংহ ও মশক' কবিতাতেও আমরা সামাজিক জীবনে উচ্চ-নীচ, বৃহৎ-ক্ষুদ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীর তাৎপর্যটি অনুভব করি। যেখানে সিংহ মশার ক্ষুদ্রত্বকে ব্যঙ্গ করে শেষে তারই দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক পরিমণ্ডলে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় — সকলের মধ্যে সাম্যভাবনা, পারস্পরিক দায়বোধ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ঘোষণা করেছেন কবি।

ক্লাসিক মানসগঠনে কাব্যসাহিত্য রচনা করলেও মধুসূদনের আন্তর স্বভাবে ছিল নরম কোমল এক লিরিক অনুভূতি। এই অনুভূতির সাবলীল অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ করি তাঁর নীতিগর্ভ বিভিন্ন কবিতায়। বাংলা সাহিত্যের তথা শিশু-কিশোর সাহিত্যের পাঠকদের কাছে এই সৃষ্টিগুলির মূল্য অনেক। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে ছোটদের মানসিকতায় যথাযথ শুভবোধ সৃজনে মধুসূদন অত্যন্ত সতর্ক এক আদর্শের আবহ তৈরি করেছিলেন।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (?)

মধুসূদন দত্তের সমকালীন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। এসময় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ছিল অনুবাদ। আর এই ধারার একজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন মধুসূদন। উনিশ শতকের অন্যতম রূপকথা রচয়িতা ডেনমার্কের Hans Andersen (1805-1875)-এর রূপকথাগুলির বাংলা অনুবাদ করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'Swan Prince'-এর অনুবাদ 'হংসরূপি রাজপুত্র' (১৮৫৭), 'The Little Marmaid'-এর অনুবাদ 'মৎস্যনারীর উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'The Ugly Duckling'-এর অনুবাদ 'কুৎসিত হংসশাবক' (১৮৫৯) প্রভৃতি। এরপর মধুসূদন ১৮৭০ সালে Ivan Krylov (1769-1844)-এর রুশদেশীয় নীতিকথাগুলির অনুবাদ করেন। 'ক্রীলফের নীতিগল্প' শীর্ষক এই বইতে মোট এক'শ সতেরোটি গল্পের অনুবাদ আছে। এই অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বইটির ভূমিকা-অংশে মধুসূদন বলেছেন, "কথাচ্ছলে ধর্ম্ম-নীতি শিখাইবার নিমিত্ত, এই গ্রন্থ উত্তম"।[১৭] এপ্রসঙ্গে বলা যায়, মধুসূদনের অনুবাদ রচনাগুলি তেমন উৎকৃষ্ট না হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বের অনুবাদকরূপে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রশংসার দাবি রাখে। বিদেশি কাহিনিনির্ভর রচনাগুলি অনুবাদ করার সময় মূল ভাববস্তুকে অক্ষুণ্ণ রেখে মধুসূদন কোন কোন ক্ষেত্রে এদেশীয় রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছেন। ফলে গল্পগুলি সেকালে বাংলার শিশু-কিশোরদের কাছে পরম আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। তবে শুধু বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে নয়, সমগ্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

ছোটদের মতো করে তখন একদিকে যেমন বিদেশি ফেবলস্ -এর অনুবাদ চলছিল, অন্যদিকে তেমনি কিছু কিছু মৌলিক রচনার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। এ সময়েই রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন

'নীতিবোধ' (১৮৫১), **গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য** লেখেন 'জ্ঞানপ্রদীপ' (১ম খণ্ড ঃ ১৮৪০, ২য় খণ্ড ঃ ১৮৫৩), **দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ** লেখেন 'নীতিসার' (১ম, ২য়, ৩য় - ১৮৫৬), **কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য** লেখেন 'নবনীতিসার' (১৮৫৮), **কেশবচন্দ্র কর্মকার** লেখেন 'বালকবোধকেতিহাস' (১৮৫৯), **হরিনাথ মজুমদার** লেখেন 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯), **তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়** লেখেন 'লঘুপাঠপদ্য' (১৮৬৪) প্রভৃতি। এছাড়াও **কালীপ্রসন্ন রায়ের** 'চরিতমঞ্জরী' (১৮৬৬), **রাজকৃষ্ণ রায়ের** 'শিশু-কবিতা' (১৮৮১), **স্বর্ণকুমারী দেবীর** 'গল্পস্বল্প' (১৮৮৯) এসময়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। এই সমস্ত রচনায় তৎকালীন দেশ-কাল-সমাজের একটা সুস্পষ্ট রূপচিত্র ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন জীবজন্তু, পশুপাখির রূপকে এখানে মানুষের সামাজিক নানান দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সমস্যার কথা প্রকাশ পেয়েছে। আবার নীতিগর্ভ রচনাগুলিতে মানুষের চারিত্রিক সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, অজ্ঞতার কুফলগুলি উল্লেখ করে সে সম্পর্কে ছোটদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই রচনাগুলির কোনো কোনোটি সরস ও সফল সাহিত্যগুণ লাভ করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর নিজে যা কিছু লিখেছেন, এবং তাঁর সমকালে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই অনুবাদধর্মী গদ্যসাহিত্য। এগুলি মূলত পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই লেখা হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে যে গদ্যসাহিত্যের সূচনা ঘটেছিল, তা প্রথম সার্থক শিল্পরূপ লাভ করে বিদ্যাসাগরের হাতে। তাঁর রচনাগুলি অনুবাদ হয়েও সহজতা ও সারল্যের গুণে মৌলিক রচনার গৌরব লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের সমকালের অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনাতেও অল্পবিস্তর শিল্পগুণ ও পরিমিতিবোধ লক্ষ করা যায়। সেখানে ছোটদের নির্মল আনন্দদানের পাশাপাশি তাদের চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষাও দান করা হয়েছে। যদিও কোনো কোনো রচনা শিশু-কিশোর সাহিত্যের নির্দিষ্ট সীমারেখাকে অতিক্রম করে গেছে। তবু বলা যায়, বাংলা গদ্যসাহিত্য ও শিশু-কিশোর সাহিত্যের সূচনাপর্বের রচনা হিসেবে এগুলির গুরুত্ব কিছু কম নয়।

এসময়ের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে যে বিষয়বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ করি তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষামূলক রচনা, বিদেশি নীতিগল্পের অনুবাদ, জীবনীসাহিত্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ইতিহাস ও পুরাণনির্ভর গল্পকাহিনি, সরস মৌলিক গল্পকথা, বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা, এমনকি বেশ কিছু ভালো কবিতাও লেখা হয় এসময়। প্রায় প্রত্যেকটি রচনাতেই রচয়িতার সহৃদয় শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। আবার চিত্র ও অলঙ্করণের মধ্য দিয়ে গ্রন্থগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার একটা সুপরিকল্পিত প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। কাজেই এই সমস্ত রচনাগুলি একদিকে যেমন বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রাথমিক উদ্যোগ বা প্রাচীন নিদর্শনরূপে স্মরণীয়, তেমনি পরবর্তীপর্বের সাহিত্যধারাকে গতিদান করার ক্ষেত্রেও এই রচনাগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য।

এরপর ধীরে ধীরে দীর্ঘকালের অনুবাদপ্রধান, নীতিনির্ভর, পাঠ্যপুস্তকধর্মী সাহিত্যচর্চা লাভ করল বন্ধনহীন মুক্ত প্রাণের ছন্দ। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার একদিকে প্রাচীন লোকজ ছড়া ও রূপকথা-লোককথার গল্পগুলিকে সহজ সরল ভাষাভঙ্গিমায় সংকলন করলেন, অন্যদিকে পূর্ববর্তী পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাধরা নিয়ম-নির্দেশিকার বাইরে মুক্ত স্বাধীন মৌলিক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সেদিক থেকে এই

দু'জন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শ্রমের বিনিময়ে বিদ্যাসাগর প্রমুখ সাহিত্যিকেরা শিশুসাহিত্যের যে অনুর্বর ভূমিকে উর্বর ও উপযুক্ত করে তুলেছিলেন, সেই ভূমিতে প্রযুক্তিনির্ভর অথচ আন্তরিক স্নেহমিশ্রিত সরস সুস্বাদু ফসল ফলালেন যোগীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, লীলা মজুমদার, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, আরো অনেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের তথা শিশু-কিশোর সাহিত্যের এক বিশাল বনস্পতি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বড়দের পাশাপাশি ছোটদের মন ও মননকে গভীরভাবে অনুশীলন করে তিনি বেশ কিছু উৎকৃষ্ট ছড়া-কবিতা-গল্প-নাটক-উপন্যাস রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো অন্য কোনো সাহিত্যিক শিশু-হৃদয়ের ভাব-কল্পনা, বিশ্বাস-স্বপ্নকে এমন বাস্তবরূপ দিতে পারেন নি। লক্ষ করা যায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশুর অবস্থান দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিমণ্ডলে। কোথাও সে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, আবার কোথাও সে বিষয়। প্রথমটিতে প্রকাশ পায় শিশুমনের চিত্র, যেখানে সে বলে —

"মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে ব'সে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
না-হয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিনও কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই?" ['প্রশ্ন', শিশু, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১৭]

শিশুর মনে এই যে ভাবগভীর জিজ্ঞাসা, এই যে মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা — এ যেন সর্বজনীন শিশু-মানসের চিরন্তন চিন্তাভাবনার নিদর্শন; তাদের মনের সজীব প্রাণময়তার প্রকাশ। অন্যদিকে চিরায়ত মানব-শিশুকে অবলম্বন করে লেখা রচনায় প্রকাশ পায় এক সুগভীর দার্শনিক-ভাবনা —

"বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।" ['খেলা', শিশু, ঐ, পৃ: ৬]

শিশুই এখানে বিষয়। অনন্ত জিজ্ঞাসার বিষয়। এপ্রসঙ্গে ড: সুকুমার সেনের (১৯০০-১৯৯২) অভিমত —

"রবীন্দ্রনাথের শিশুভাবনা এসেছিল দু পথে। এক তাঁর শৈশবকাল থেকে আত্মভাবনা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে। দুই বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরস থেকে। এই দ্বিপথ অনুসারে

রবীন্দ্রনাথের শিশুভাবনা কবিতাগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ছেলেমানুষি আচরণ ও ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কিত কবিতাগুলি। দ্বিতীয় ভাগের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা স্নেহাতুর মায়ের মতো, বালগোপালের মুগ্ধ উপাসকের মতো।"[১৮]

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলিই শিশু-কিশোর চরিত্র ও মনের উপযোগী, দ্বিতীয়টি নয়। তবে শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি কিছু কম নয়। তা যেমন বিচিত্রমুখী, তেমনি সুবিস্তৃত। শিশু (১৯০৩), শিশু ভোলানাথ (১৯২২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা; মুকুট (১৯০৮),[১৯] লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৮৮৫) প্রভৃতি নাটক; গল্পসল্প (১৯৪১)-এর বিভিন্ন গল্প এবং গল্পগুচ্ছের পোস্টমাস্টার (১৮৯১), গিন্নি (১৮৯১), ছুটি (১৮৯২), কাবুলিওয়ালা (১৮৯২)-এর মতো উৎকৃষ্ট কিছু গল্প; খাপছাড়া (১৯৩৬), ছড়ার ছবি (১৯৩৭), ছড়া (১৯৪১) প্রভৃতি ছড়াগ্রন্থ এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে সে (১৯৩৭) ও ছেলেবেলা (১৯৪০) বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া 'ছেলেভুলানো ছড়া' (১৯০৭) প্রবন্ধ-সংকলনে প্রাচীনকালে লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের কাছে এক নতুন ভুবন হাজির করেছেন।

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের জগতে এক ভিন্ন স্বাদের শিল্পসৃষ্টি 'সহজ পাঠ'। এর প্রথম দু'টি খণ্ড 'প্রথম ভাগ' ও 'দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ পায় ১৯৩০ সালে। "পরে অবশ্য 'সহজ পাঠ'-এর তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি হল রবীন্দ্রনাথসহ অন্য অনেকের রচনার সংকলন।"[২০] 'সহজ পাঠ'-এর প্রথম ভাগে ১০টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ১৩টি পাঠ আছে। 'বর্ণপরিচয়' যদি শিশুর ভাষা-শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ হয়, তবে 'সহজ পাঠ' নিঃসন্দেহে তার সাহিত্যরসাস্বাদের প্রথম অধ্যায়। যার বর্ণবিন্যাসের অপূর্ব কারিগরি, চিত্রের মাধ্যমে বাক্‌নির্মিতি, মৌখিক কথনভঙ্গির মাধুর্য যে কোনো শিশুর প্রাথমিক পর্বের পাঠগ্রহণের প্রধান আকর্ষণ। এখানে ছোট ছোট বাক্যে বর্ণপরিচয় দেবার জন্য তাল, লয়, সুর ও ছন্দের সংযোগে অপরূপ পরিবেশ তৈরি করেছেন কবি। এই পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিশুর কল্পনাবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। 'সহজ পাঠ'-এর প্রথম পাঠে যখন সে বলে,

"ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখে নি সে কথা কওয়া।" [সহজপাঠ, পৃ: ৩]

বা,

"ক খ গ ঘ গান গেয়ে
জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।" [ঐ, পৃ: ৯]

— তখন বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে তার সাহিত্যবোধেরও বিকাশ ঘটতে থাকে। এই 'সহজ পাঠ'-এ ছোটো খোকা একইসঙ্গে দেখতে পায় গ্রামবাংলা ও নগর জীবনের ছবি। একদিকে 'আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে' (দ্বিতীয় পাঠ ঃ প্রথম ভাগ), অন্যদিকে 'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে' (একাদশ পাঠ ঃ দ্বিতীয় ভাগ) — এ নিছক ভাষাশিক্ষার উপকরণ নয়; এখানে সর্বস্তরের শিশুদের মনের মতো করে পাঠবিন্যাসের পরিকল্পনা

করেছেন কবি। সুর, ছন্দ, ধ্বনি ও ছবির প্রতি শিশুমনের আকর্ষণের উপযোগী করে বইটির বিভিন্ন পাঠ রচনা করা হয়েছে। অনেক অভিজ্ঞতার পরে পরিণত বয়সে শিশুপাঠ্য গ্রন্থটি রচনা করে কবি তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। এই 'সহজ পাঠ' যেমন শিশুশিক্ষার একটি দুর্লভ গ্রন্থ, তেমনি এই গ্রন্থের সঙ্গে মুদ্রিত নন্দলাল বসু অঙ্কিত ছবিগুলিও আমাদের সাহিত্য-শিল্পের অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে সুকুমার সেনের অভিমত,

> "..... রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের তুল্য সহজ সরল বিজ্ঞানসম্মত শিশুপাঠ্য বই আমি আর কোন ভাষায় লেখা হয়েছে বলে জানি না।"[২১]

অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন,

> "সহজপাঠের প্রাণ সাহিত্যসৌন্দর্য। তা বলে তাতে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি অনুসরণে কোনো ত্রুটি ঘটেছে তা নয়।"[২২]

শিশুমনকে, শিশুমনের চাহিদাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর সব রচনাতেই শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, রাগ-অভিমান, আশা-ভালোবাসা বড় বেশি করে স্থান পেয়েছে। কবির ব্যক্তিগত শৈশব জীবনের নানা সুখ-দুঃখের স্মৃতিও সেখানে দেখা দিয়েছে বারবার। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় সেই মুক্তিকামী চিরন্তন শিশুর ছবিই ফুটে উঠেছে। সেখানে দুরন্ত শিশুমনের গোপন বাসনাগুলি যেন ভাবে-ভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই কখনো সে ভাবে,

"যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্‌খনি হই
ইচ্ছামতী নদী।" ['ইচ্ছামতী', শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩]

কখনো আবার কল্পনার ডানা মেলে সে বলে,

"আজকে আমি কত দূর যে
গিয়েছিলেম চলে।
যত তুমি ভাবতে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।" ['পথহারা', শিশু ভোলানাথ, ঐ, পৃ: ৫৫৬]

শিশুমনের এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাব-কল্পনার সুন্দর নিদর্শন 'বীরপুরুষ' কবিতাটি। যা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে এই কবিতাটি আবৃত্তির প্রাক্কালে কবি বলেন ঃ

"বীরপুরুষ। ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী
অনেক বড়ো বড়ো বীরপুরুষের কাহিনী তো বলা হয়েছে, তারা যুদ্ধ করে মাকে উদ্ধার করেছে। আমি বলব — একটি ছোট্ট বীরপুরুষ সে, এখনও বীরত্ব তার শুরু হয় নি, সে কল্পনা করছে বড়ো হলে বোধ হয় সে মার জন্যে লড়াই করবে ও মাকে উদ্ধার করবে।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ এখানে শিশুর অন্তরে সংগুপ্ত বীরসত্তাটিকে প্রকাশ করেছেন। যে খুব সহজেই নিজেকে 'বীরপুরুষ' রূপে কল্পনা করে নিয়ে বলতে পারে,

"মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে মা চ'ড়ে
দর্‌জাদুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।।" [বীরপুরুষ, পৃ: ৭]

আমরা লক্ষ করি, রবীন্দ্রনাথ শিশুর বিচিত্ররূপ দেখেছেন, বিচিত্রভাবে তাদের তুলে ধরেছেন। 'খাপছাড়া' গ্রন্থের ৬৩ নং ছড়ায় শিশু ভোলানাথের এমনি এক রূপ দেখা যায়,

"ভোলানাথ লিখেছিল,
তিন - চারে নব্বই,
গণিতের মার্কায়
কাটা গেল সর্বই।
তিন - চারে বারো হয়,
মাস্টার তারে কয় —
'লিখেছিনু ঢের বেশি'
এই তার গর্বই।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৬৬]

আবার 'ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি'র পাঁচ বোনের উদ্ভট কাণ্ডকারখানা (১নং ছড়া) বা 'দামোদর শেঠ'-এর মজার খাদ্যতালিকা (২নং ছড়া) তাদের অসঙ্গতির জন্যই চিরকালের শিশুর মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে থাকবে; অমর হয়ে থাকবে 'ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা' (৩নং ছড়া)। বক্তব্যের সারল্য, ছন্দের দোলা, শ্রুতিমধুরতা — সব মিলিয়ে 'ছড়া', 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ছড়া-কবিতা বাংলার ছেলেমেয়েদের চির আদরের ধন, অনন্ত আনন্দের সামগ্রী।

এই সমস্ত ছড়ার বিশেষত্ব সম্পর্কে কবি-ছড়াকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন,

> "এই ছবিগুলি ছেলেদের জন্য লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়, রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভীজাত নয়।"[২৪]

ছড়া কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু ছোট ছোট গল্পও রচনা করেছেন। সেগুলি 'গল্পসল্প' গ্রন্থে প্রকাশ পায় ১৯৪১ সালে। সেখানে 'বিজ্ঞানী'গল্পের ভুলোমনা নীলমণিবাবু, 'চন্দনী' গল্পের রাজপুত অরিজিতের বীরত্ব, 'ক্যামিল' গল্পে ছোট্ট মেয়ে ক্যামিলের করুণ কাহিনি,'রাজরাণী', 'পরী' গল্পে রূপকথার রোমাঞ্চ ছোটদের মন ছুঁয়ে যায়, তাদের আনন্দ দেয়। অবশ্য 'গল্পগুচ্ছে'ও শিশু, কিশোর চরিত্রের অভাব নেই। 'পোস্ট মাস্টার' (১৮৯১) গল্পের বালিকা রতন, 'গিন্নি' (১৮৯১) গল্পের বালক আশু, 'ব্যবধান' (১৮৯১) গল্পের বনমালী, 'কাবুলিওয়ালা' (১৮৯২) গল্পের ছোট্ট মিনি, 'ছুটি' (১৮৯২) গল্পের ফটিক, 'অতিথি' (১৮৯৫) গল্পের তারাপদ প্রভৃতি চরিত্রগুলি তাদের স্নেহে, প্রেমে, বাৎসল্যে, দুরন্তপনায়, উদারতায়, উদাসীনতায় সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে। অন্যদিকে 'ডাক ঘর' (১৯১২), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) এবং কিছু হাস্যকৌতুকপূর্ণ নাটিকাও (১৯০৭) ছোটদের মন জয় করার মতো অপার আনন্দের খোরাক যোগান দেয়। এই নাটকগুলি ছোটদের সরল মনের মুক্ত প্রাণের সংবাদ বহন করে। শিশু-মনস্তত্ত্ব এসমস্ত নাটকে সুন্দরভাবে উপস্থিত হয়েছে। জানা যায়, 'বালক' এবং 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বালক-বালিকাদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করে প্রকাশ করেন। 'বালক' ও 'ভারতী'-তে প্রকাশিত নাটকগুলির প্রথমে নাম ছিল "হেঁয়ালি নাট্য"। পরে (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) সেগুলি একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় "হাস্যকৌতুক" নামে।[২৫]

অন্যদিকে 'সে' ও 'ছেলেবেলা' রবীন্দ্রনাথের শিশু-কিশোর সাহিত্যসম্ভারের অমূল্য সম্পদ। 'সে' গ্রন্থে সে, পুপেদিদি আর কথককে নিয়ে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের নানা গল্পকথা। বিচিত্র কাল্পনিকতার আশ্রয়ে তিনি এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে ছোটদের মনের অনন্ত চাহিদা, অবাধ কল্পনার বিষয়গুলিকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। অবশ্য কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাষাশৈলীর পাশাপাশি চিত্রশিল্পেরও সুন্দর উপস্থাপন করেছেন। ছোটরা গল্প পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখতেও খুব ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ছোটদের সেই ইচ্ছে পূরণ করেছেন। অন্যদিকে 'ছেলেবেলা' কোন গল্পকাহিনি নয়, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্মৃতিকথা। লেখক এখানে নিজের শৈশবের নানান কান্নাহাসি মেশা রঙ-বেরঙের দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করেছেন শেষ বয়সে এসে। তবে রচনাটিতে কোথাও সেই বয়সের ছাপ পড়েনি, বরং প্রাঞ্জল শৈশবের রসে সিক্ত হয়ে তা লাভ করেছে এক অপূর্ব সাহিত্যময় রূপ ও রঙ। এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতির পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির খণ্ড খণ্ড চিত্র, বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থিতি ছোটদের বিচিত্র মানসভ্রমণের আনন্দ দিয়ে থাকে।

আমরা লক্ষ করি, রবীন্দ্রনাথ কখনোই ছোটদের 'ছোট' ভেবে উপেক্ষা করেন নি, অবহেলা করেন নি। বরং ছোটদের জন্য সস্নেহে সৃষ্টি করেছেন বড়দের মতোই বিচিত্র ও বিশিষ্ট শিশুজগৎ। সে জগতে ছোটদের মনের মতো করে রঙিন কথার খেলনা সাজিয়ে দিয়েছেন। গল্পে, ছড়ায়, ছোট ছোট গদ্যে, নাটিকায় মনোহারী এই খেলনাগুলি ছোটদের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা দখল করে আছে। তাঁর লেখা ছোটদের রচনা সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ড: ইতিমা দত্ত বলেছেন,

> "প্রতিটি মানুষের ভিতর এক চিরশিশু বিদ্যমান। বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের বিচারশক্তি, যুক্তি ইত্যাদির ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু মন থেকে শৈশব জীবনের মানসিকতা, কৌতূহলী মন, কল্পনা-প্রবণতা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায় না। পরবর্তী জীবনে কোন না কোনভাবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাণহীন ও যান্ত্রিক জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শৈশব জীবনের মানসিকতা নিয়ে সাহিত্যের আসরে শিশুচরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন।"[২৬]

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের আলোচনায় বারবার যে পরিবারের ভূমিকা ও অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, তা হ'ল রায় পরিবার। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের সোনালি অধ্যায়ের সূচনা ঘটে এই পরিবারের সদস্যদের লেখনীতেই। যাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুকুমার, সত্যজিৎ, সুখলতার কথা আমরা সবাই জানি। এই পরিবারে সাহিত্যচর্চার উৎকৃষ্ট পটভূমি গড়ে ওঠে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সক্রিয় প্রচেষ্টায়। আসলে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য তখনও তেমনভাবে অঙ্কুরিত ও মঞ্জরিত হয়ে ওঠে নি। কিছু কিছু স্কুলপাঠ্য নীতিকথাধর্মী গ্রন্থ আর মা-ঠাকুমাদের মুখে শোনা লোকজ ছড়া-গল্প-রূপকথার উপর নির্ভর করেই তখনকার শিশুদের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হত। এসময় পল্লীবাংলার রূপে-রসে স্নিগ্ধ সিক্ত লোককথা ও ছড়াগুলিকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর তাঁদের অন্যতম। তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটে 'সখা' (১৮৮৩) পত্রিকায় প্রকাশিত 'মাছি' (১৮৮৩) নামক গদ্য রচনার মাধ্যমে। শুধুমাত্র ছোটদের সাহিত্য সৃষ্টিতেই তিনি আজীবন নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যদিও তাঁর ছোটদের উপযোগী গ্রন্থ সংখ্যা খুব বেশি নয়, তবুও সাহিত্যগুণের বিচারে সেগুলির ব্যাপ্তি ও গভীরতা অসাধারণ। তার মধ্যে 'সেকালের কথা' (১৯০৩), 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৯০৭), 'ছেলেদের মহাভারত' (১৯০৯), 'টুনটুনির বই' (১৯১০), 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহজ ভাষা, সরল প্রকাশভঙ্গি ও অপূর্ব কল্পনার সমন্বয়ে রচিত তাঁর কাহিনিগুলিতে যেন বাস্তব জগৎ ও জীবনই অনুপুঙ্খভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

অবশ্য ছোটদের উপযোগী সাহিত্য রচনার পাশাপাশি প্রকাশনার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ছোটদের বইয়ের রুচিশীল সুচারু অলঙ্করণ, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মুদ্রণ ও প্রকাশনা তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। তিনি নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলেন ছোট একটি প্রকাশন সংস্থা

'ইউ রে এ্যান্ড সন্স' (১৮৯৫)। সেখান থেকেই একে একে প্রকাশ পায় 'সেকালের কথা', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। এছাড়া শিশু-কিশোরদের অন্যতম প্রিয় 'সন্দেশ' পত্রিকাটি ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে এই প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশ পায়। জানা যায়, সেকালের বিখ্যাত লেখক-লেখিকা, চিত্রশিল্পী ও আলঙ্কারিকেরা নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে এই পত্রিকায় লেখা ও ছবি দিতেন। 'কেউ একটা পয়সা পেতেন না, কিন্তু লেখক ও আলঙ্কারিকেরা তাদের কাজ মুদ্রিত দেখলে গর্বিত হতেন।'[২৭] ছোটদের জন্য তাদের মনের মতো করে সযত্নে ও সস্নেহে উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ'-এর পাতায় পাতায় উপহার দিতেন দেশ বিদেশের বিচিত্র সব কাহিনি আর মনোহারী রঙ-বেরঙের ছবি। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'সন্দেশ' বাংলার অগণিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য 'সন্দেশ' প্রকাশের দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। তারপর 'সন্দেশ'-এর সম্পাদক হলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়।

'টুনটুনির বই' বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের এক চিরন্তন সম্পদ। প্রাচীন লোককথার নবরূপায়ণ হিসেবে গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। যেখানে পশুপাখি পরিবেষ্টিত প্রাণবন্ত প্রকৃতির মাঝে ছোটরা খুঁজে পায় তার নিজস্ব জগৎ। সে জগতের স্মৃতি আজীবন তার মনের গভীরে সঞ্চিত থাকে। সেদিক থেকে বলা যায়, কেবলমাত্র 'টুনটুনির বই' গ্রন্থটির জন্যই উপেন্দ্রকিশোর চিরকাল বাংলার শিশু-কিশোরদের কাছে আদরণীয় হয়ে থাকবেন। গ্রন্থের ভূমিকা-অংশে তিনি বলেছেন,

> ''সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।''[২৮]

উপেন্দ্রকিশোর অত্যন্ত স্নেহে যত্নে সেই সমস্ত মা-ঠাকুমার মুখের গল্পগুলিকে সংকলন করলেন 'টুনটুনির বই'-এ। আসলে তাঁর মনটি ছিল খুব সহজ সরল শিশুসুলভ। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা নিয়েই তিনি এসেছিলেন শিশুসাহিত্যের আঙিনায়। উপেন্দ্রকন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৯০-১৯৭৪) তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থনে বলেছেন,

> ''ছোট ছেলেমেয়েদের বাবা বড় ভালবাসতেন। শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই আনন্দে তিনি হাসি-খেলা নাচ-গানে মেতে উঠতেন। ছোটদের ভালবাসতেন, তাদের মন বুঝতেন বলেই বুঝি এমন সুন্দর সহজ মিষ্টি হত তাঁর লেখা।''[২৯]

'টুনটুনির বই' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিচিত্র স্বাদের ২৭টি গল্পকথা। গল্পগুলির মূল আকর্ষণ তার সহজ সাবলীল ভাষা এবং সরল প্রকাশভঙ্গি। তার সাহিত্যমূল্যও অসাধারণ। আমরা দু'একটা দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে পারি। যেমন, 'টুনটুনি আর বেড়ালের কথা'। সেখানে দেখা যায়, এক গৃহস্থের ঘরের বেগুনগাছে বাসা বেঁধেছে টুনটুনি। বাসায় তার ছোট ছোট তিনটি ছানা। তারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে আর চীঁ-চীঁ করে। এদিকে গৃহস্থের দুষ্টু বিড়ালটার ভারী ইচ্ছে 'টুনটুনির ছানা খাব'। সেই লোভে

সে প্রতিদিন বেগুনগাছের তলায় আসে। কিন্তু বুদ্ধিমতী টুনটুনি তাকে 'মহারাণী' বলে প্রণাম জানালে সে খুশি হয়ে ফিরে যায়। এভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে টুনটুনির ছানারা। একদিন তারা উড়ে গিয়ে বসে তাল গাছের ডালে। মা টুনটুনি এবার তৈরি হয়ে থাকে বিড়ালকে উচিত শিক্ষা দিতে। তাই বিড়াল এসে টুনটুনির খোঁজ নিলেই সে লাথি দেখিয়ে বলে, 'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী'। বলেই সে ফুড়ুক করে উড়ে পালায়। দুষ্টু বিড়াল তাকে ধরতে পারে না, ছানাও খেতে পারে না। বরং বেগুন গাছের কাঁটায় খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ফিরে আসে।

গল্পটি যেমন মজার, তেমনি শিক্ষারও। অথচ শিক্ষা বা উপদেশ কোথাও প্রকট হয়ে ওঠে নি। নীতি বা তত্ত্ব কোথাও আলাদাভাবে প্রযুক্ত হয়নি। তাই গল্পটি আগাগোড়া আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করবার মতো। এর মধ্যে যেমন চমৎকার কাহিনিরস আছে, তেমনি আছে সূক্ষ্ম বুদ্ধির খেলা। হাসি, খুশি, মজা, বুদ্ধি, কল্পনা সব কিছু মিলিয়ে গল্পটি ছোটদের মনের জগতে এক অনন্য মজাদার আবেদন সৃষ্টি করে। আসলে ছোটরা বুদ্ধির লড়াই খুব পছন্দ করে। তারা মজা পায় বুদ্ধির জোরে বারবার ছোট্ট টুনটুনির জিতে যাওয়ার ঘটনায়। তাই বোধহয় 'টুনটুনি আর রাজার কথা' গল্পটি আজও তার আকর্ষণ হারায় নি। সেখানে ছোট্ট টুনটুনির সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে প্রভাবশালী রাজা বারবার পরাভূত হয়েছেন এবং শেষপর্যন্ত নাক কাটা গিয়ে বেশ সাজা পেয়েছেন। এখানে গল্পের জমাট বাঁধুনির সঙ্গে রয়েছে দুই চরণের ছোট ছোট মজাদার ছড়া। ছোটরা দ্রুত গল্পটি পড়ে ফেলে আর শেষে সুর করে বলতে থাকে —

"বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!" [আলোর ফুলকি, ১৯৮০, পৃ: ১৭৩]

অথবা,

"নাক-কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!" [ঐ, পৃ: ১৭৪]

এমনি মজার মজার অনেক গল্প আছে 'টুনটুনির বই'-এ। এগুলি ছোটদের খুব প্রিয়। দেখা যায়, বাঘ আর শিয়ালকে নিয়ে প্রচলিত বেশ কয়েকটি মজার গল্পও স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। সেগুলির মধ্যে 'বাঘের উপর টাগ', 'দুষ্টু বাঘ', 'নরহরি দাস', 'বাঘখেকো শিয়ালের ছানা', 'বোকা কুমির' প্রভৃতি গল্পগুলি খুবই প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। একবার এগুলি শুনলে বা পড়লে আর ভোলা যায় না। ধরা যাক্, 'দুষ্টু বাঘ' গল্পটির কথা। যেখানে রাজবাড়ির লোহার খাঁচায় বন্দী এক দুষ্টু বাঘ একজন দয়ালু ঠাকুরমশাইকে অনুরোধ জানায় খাঁচার দরজা খুলে দিতে। ঠাকুরমশাই দরজা খুলে দিলে বাইরে এসে বাঘটা তাকেই খেতে চায়। শেষপর্যন্ত এক চালাক শেয়ালের বুদ্ধির জোরে বাঘটা আবার খাঁচায় বন্দী হয় এবং ঠাকুরমশাই উপলব্ধি করেন, 'দুষ্টু লোকের উপকার করতে নেই'।

অন্যদিকে 'বাঘখেকো শিয়ালের ছানা' এবং 'নরহরিদাস' গল্প দু'টির মূল ভাববস্তু অভিন্ন। উভয়ক্ষেত্রেই

রয়েছে বুদ্ধির সূক্ষ্ম ও সুন্দর প্রয়োগ। যা শুধু ছোটদের নয়, সব শ্রেণীর পাঠকদেরই হাসি, মজা ও বুদ্ধির খোরাক যোগান দেয়। অতএব গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধির জোরে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার এমন অনেক মজার ও হাসির গল্প ছড়িয়ে রয়েছে 'টুনটুনির বই'-এ। সত্যি, বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্মলগ্ন যে এত উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধশালী ছিল, এই সংকলনগুলি না থাকলে তা জানা যেত না।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম ও প্রধান পরিচিতি 'টুনটুনির বই'-এর লেখকরূপে। যদিও তাঁর লেখা ছোটদের উপযোগী রামায়ণ, মহাভারতের গল্পকাহিনিগুলিও ছোটদের কাছে সমান আকর্ষণীয়। গল্পগুলির মূলকাহিনি পুরাণনির্ভর হ'লেও উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব সাবলীল গল্প বলার ধরনটি কাহিনিগুলিকে সরল ও সরস করে তুলেছে। মহাকাব্যোচিত ভাবগাম্ভীর্য ও বিশালতা এখানে নেই। এখানে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্রগুলিকে ছোট ছোট অংশে আকর্ষণীয় আঙ্গিকে ছোটদের মনের মতো করে পরিবেশন করা হয়েছে। বিশেষ করে, রাজপুরীর রূপকথাধর্মী বিচিত্র দৃশ্য-কল্পনা, রাক্ষস-রাক্ষসীর বর্ণনা, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ, ভাইয়ে-ভাইয়ে সখ্যতা — এ সবই ছোটদের কল্পনার জগৎকে প্রসারিত করে, তাদের মুগ্ধ করে। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) নিজের শৈশবের স্মৃতি রোমন্থনে উপেন্দ্রকিশোরের 'রামায়ণ' প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে বইতে আমি জেনেছিলুম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ', ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র, বিচিত্রমধুর, সে-বই ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী।"[৩৩]

'সেকালের কথা' উপেন্দ্রকিশোরের সাহিত্যসম্ভারে একটু ভিন্ন স্বাদের রচনা। এখানে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে লেখক ছোটদের জন্য তুলে এনেছেন ডাইনোসর, টাইরানোসর, স্টিগোসরস্ প্রভৃতি বিচিত্র সব জন্তু-জানোয়ারদের। যাদের চিত্রময় প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছোটদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে।

দেখা যায়, সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের পাশাপাশি শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরও তাঁর সুগভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন বিচিত্র সৃষ্টিকর্মে। তাই তাঁর গ্রন্থসংখ্যা স্বল্প পরিমাণ হলেও সেগুলি অমর হয়ে আছে বাঙালি শিশুর মনে। দেশ-কাল-সমাজের সীমাকে অতিক্রম করে রচনাগুলি ছোটদের মনে একাধারে আনন্দ, মজা আর শুভবোধ সঞ্চার করে চলেছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭)

উপেন্দ্রকিশোরের সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট শিশু-কিশোর সাহিত্যিক হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে দু'বছরের ছোট হলেও শিশুসাহিত্য সম্পাদনা ও প্রকাশনার জগতে এসেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের বছর দুয়েক আগেই। শিশুসাহিত্যের একজন আদর্শ লেখক ও প্রকাশকরূপে তিনি আজীবন তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ছোটদের বইগুলি সুন্দরভাবে সযত্নে প্রকাশের জন্য তিনি 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে একখানি নিজস্ব প্রকাশনী স্থাপন করেন। এই সংস্থা থেকেই প্রকাশ পায় তাঁর সংকলিত প্রথম গ্রন্থ 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১)। প্রচলিত নীতি বা উপদেশ প্রচারের ধারাকে বর্জন করে তিনি ছোটদের মাঝে

সস্নেহে বিলিয়ে দিলেন হাসি, মজা আর আনন্দের উপহার। সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা এ সংকলনে স্থান পায়। উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পাশাপাশি এই সংকলনে প্রমদাচরণ সেন, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের রচনা সগৌরবে স্থান পায়। এরপর যোগীন্দ্রনাথ ছবি ও গল্প (১৮৯২), রাঙা ছবি (১৮৯৬), হাসি-খুসি (১ম ভাগ ১৮৯৭; ২য় ভাগ ১৯০৪), হাসিরাশি (১৮৯৯), মজার গল্প (১৯০৬), বিদ্যাসাগর (১৯০৮, জীবনী), শকুন্তলা (১৯১০), লব-কুশ (১৯২৬), জানোয়ারের কাণ্ড (১৯২৭), আষাঢ়ে গল্প (১৯৫০), মোহনলাল (১৯৫০), শিশু চয়নিকা (১৯৬৪) প্রভৃতি সব সংকলন ও মৌলিক রচনা মিলে ৭৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তিনি Jonathan Swift (1667-1745)-এর Gulliver's Travels (1726), Daniel Defoe (1660-1731)-এর Robinson Crusoe (1719) প্রভৃতি বিদেশি গ্রন্থের সহজ সরল বঙ্গানুবাদ করেন।

যোগীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনিই প্রথম খুব সচেতনভাবে ছোটদের সাহিত্যে মজা ও আনন্দের উপাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রদান করেছেন। একদিকে গভীরভাবে শিশুমনস্তত্ত্ব অনুধাবন করে তাদের পছন্দের জগৎকে সাহিত্যে জীবন্তরূপ দান করেছেন, পাশাপাশি ছোটদের চিন্তা, চেতনা, কল্পনা ও চরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশের দিকেও যোগীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল। দেখা যায়, ভারতীয় পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র ও কাহিনিকে তিনি প্রকাশ করেছেন ছোটদের উপযোগী করে, তাদের মানসগঠনের সহায়করূপে। আবার সাধারণ বিষয়কে রঙ, তুলি আর ভাষার সুন্দর সামঞ্জস্যে অসাধারণভাবে উপস্থিত করার বিরল প্রতিভা ছিল তাঁর। 'হাসি-খুসি'-তে অজগরের তেড়ে আসার পাশাপাশি 'হাসিরাশি'-তে জিলিপির তেড়ে আসার সজীব চিত্র দু'টি শিশুরা যেন তাদের কল্পনার চোখে প্রত্যক্ষ অনুভব করে। সুকুমার রায়ের আগে বাংলা শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথের রচনাতে শোনা যায় অসাধারণ উদ্ভট আজগুবি খেয়ালের কবিতা। যে খেয়ালের বশে যোগীন্দ্রনাথ সহজেই ছোটদের জন্য গড়ে তুলেছেন 'আজব চিড়িয়াখানা'। যেখানে —'সিংহের যদি পিছন দিকে/থাকত কেশর ঝুঁটি,/ক্যাঙ্গারুর পা লম্বা হত/সামনেতে যে দুটি/..... দেখতে তবে কেমন হত, ভাবছি বসে তাই,/কেউ কখনো দেখেনি যা/তাই ত দেখা চাই!' এমনই বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে যোগীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভারে। 'খোকার স্বপ্ন', 'সাধের ঘোড়া', 'মজার মুল্লুক', 'বীর শিশু', 'পেটুক দামু', 'কাজের ছেলে', 'কাকাতুয়া', 'মামার বাড়ি', 'হারাধনের দশটি ছেলে' প্রভৃতি ছড়া-কবিতায় একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ মেলে। এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে 'প্রার্থনা', 'প্রার্থনাসঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতার কথা। যেখানে চিরকালের শিশুর হয়ে কবিই যেন প্রার্থনা করেছেন —

"ছোটো শিশু মোরা তোমার করুণা হৃদয়ে মাগিয়া লব
জগতের কাজে জগতের মাঝে আপনা ভুলিয়া রব।

.....

সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি যেন এ জীবন ধরি;
অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে জীবন সফল করি।।"

[প্রার্থনা ঃ শিশু চয়নিকা, পৃ: ২২]

অন্যদিকে যোগীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসেও ছোটদের মনে সুভাবনা,শুভবোধ জাগানোর উপযোগী বহু উপাদান দেখা যায়। বিশেষ করে, 'ছোটো চোর ও বড়ো চোর' গল্পটি এবং 'মোহনলাল' উপন্যাসটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আবার বিভিন্ন জীবজন্তু, কীটপতঙ্গের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও তথ্য দিতে গিয়েও তিনি সহজ সরল শিশু-মনোহারী মজার আঙ্গিকটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত গল্পগুলিও অধিকাংশই পশুপাখি নির্ভর। যেমন, 'টুনি পাখি', 'শিয়ালের ধূর্তামি', 'লম্বাদাড়ি', 'কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ', 'রাক্ষুসে বাঘ', 'বাঘে কুমিরে', 'আষাঢ়ে গল্প' প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অক্ষয় ও অমূল্য সম্পদ।

যোগীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি হ'ল 'খুকুমণির ছড়া' (১৩০৬ বঙ্গাব্দ/১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)। বাংলার গ্রামে গ্রামে লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত ছোট-বড়-মাঝারি মাপের চার'শরও বেশি ছড়াকে সংগ্রহ করে তিনি সযত্নে স্থান দিয়েছেন ছাপা অক্ষরে। যে ছড়াগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যের বা শিশু সাহিত্যের নয়, বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিরও প্রাচীনত্ব বহন করে। বহন করে আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস; তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্চা, আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, সুখ-দু:খ, আশা-ভালোবাসার নানান অনুপুঙ্খ রূপচিত্র। যা যুগ যুগ ধরে বাঙালি-হৃদয়কে, তার শৈশব-কৈশোরকে মুগ্ধ করে চলেছে, সমৃদ্ধ করে চলেছে। এমন একটি গ্রন্থের মূল্যায়ন সহজ কাজ নয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'-অংশে সশ্রদ্ধচিত্তে বলেছেন —

> 'ইংরেজীতে বালক জনের চিত্তাকর্ষক বিবিধ সাহিত্যগ্রন্থ রাশি রাশি বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। এজন্য তিনি বঙ্গের বালক-বালিকাগণের ও তাহাদের পিতামাতাদিগের সর্ব্বথা কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই।''[৩১]

রামেন্দ্রসুন্দর এই 'ভূমিকা'-তেই উল্লেখ করেছেন যে, এই ছড়া-সংকলন প্রকাশের আগেই রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কবিতা-সংগ্রহের অভাব বোধ করেন এবং প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি ছড়া' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; যা পরবর্তীকালে 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়। অবশ্য যোগীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এখানেই যে, তিনি শুধু লোকজ ছড়া-কবিতাগুলিকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন নি, সেগুলিকে সুঅলঙ্কৃত করে সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করেছেন। যা সহজেই ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাদের চঞ্চল মনকে শান্ত করে। আবার এই সমস্ত ছড়ার বিষয় সবক্ষেত্রে শিশুর বোধগম্য না হ'লেও তার ছন্দদোলা, শ্রুতিমাধুর্য ছোটদের অনাবিল আনন্দ দেয়। আসলে ছোটরা ছড়ার 'দোল দোল দুলুনি' ছন্দকে যতটা ভালোবাসে, ততটা তার অন্তর্নিহিত অর্থকে নয়। অবশ্য ছন্দ-সুর-তাল-লয়-ধ্বনির সঙ্গে যদি অর্থের সাযুজ্য ঘটে যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। যেমন,

"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে,
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে,
সরু সরু চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
কে দেখেছে— কে দেখেছে? দাদা দেখেছে
দাদার হাতে বাজু-বন্ধ ছুড়ে মেরেছে—
উ-হু-হু — বড্ড লেগেছে।" ['ঝোটন বাঁধা'। খুকুমণির ছড়া। পৃ: ১৮৩]

অথবা,

"ওখানে কে রে?/ আমি খোকা।
মাথায় কি রে?/ আমের ঝাঁকা।
খাস্ নে কেন রে?/ দাঁতে পোকা।
বিলুস্ নে কেন রে?/ ওরে বাবা!" ['ওরে বাবা'। ঐ। পৃ: ৩৩]

— এই সমস্ত ছড়াগুলি তাদের সজীবতায়, চিত্রময়তায় আজও তেমনি মনোহারী হয়ে আছে। লক্ষ করা যায়, ছোটরা অসঙ্গত, অসম্ভব বিষয়কে খুব পছন্দ করে। পছন্দ করে অলীক কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে সারা জগৎটাকে। অবশ্য শিশুর নিজস্ব জগতে সবটাই স্বাভাবিক, সবটাই বিশ্বাস্য। তাইতো 'হাট্টিমা টিম্ টিম্' গোছের ছড়া এমন চিরন্তনতা লাভ করে। যোগীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মা-ঠাকুমার মুখে-মুখে রচিত এমন সব স্নিগ্ধ, নির্মল, বিচিত্র ছড়াগুলিকে সস্নেহে উপহার দিয়েছেন বাঙালি শিশুর হাতে।

আমরা এই ছড়া-সংকলনের প্রায় চার'শরও বেশি ছড়াকে তাদের বিষয়গত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে কয়েকটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। যথা—১. ছেলে ভুলানো ছড়া, ২. ছেলে খেলার ছড়া, ৩. নির্মল মজার ছড়া, ৪. পশু-পাখি তথা প্রাণীবিষয়ক ছড়া, ৫. ফুল-ফল-গাছপালা বিষয়ক ছড়া, ৬. ঋতু-প্রকৃতি বিষয়ক ছড়া, ৭. ঘুমপাড়ানি ছড়া, ৮. লেখাপড়া বিষয়ক ছড়া, ৯. কাহিনি-প্রধান ছড়া, ১০. বিবাহ বিষয়ক ছড়া, ১১. সামাজিক-পারিবারিক রীতি-নীতি বিষয়ক ছড়া। এ ছাড়াও রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় ও ভাববিশিষ্ট রঙ-বেরঙের ছড়া-কবিতা।

সুতরাং সংকলন, মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্ভার সুসমৃদ্ধ। উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনা সৃষ্টির পাশাপাশি সেগুলির যথাযথ মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও যোগীন্দ্রনাথের সযত্ন প্রয়াস ছিল। তাঁর বিচিত্র সাহিত্যধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। আমরা লক্ষ করি, লীলা মজুমদার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন। আমরা যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক মূল্যায়নে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৮৮-১৯৬৩) মন্তব্যটি এখানে তুলে ধরতে পারি,

"শিশুপাঠ্য পুস্তক যে ছোটোদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল এবং সেইসঙ্গে তা যে ছেলেমহলে খেলার মতো লোভনীয় আনন্দ বিতরণ করতে পারে, এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তকের

সঙ্গে এই শ্রেণীর সুকুমারসাহিত্য যে তাদের হাতে দেওয়া অত্যন্ত দরকার; কেতাবের পর কেতাব প্রকাশ করে বাঙালি অভিভাবকদের মস্তিষ্কে এই সৎবুদ্ধি দান করেছিলেন সর্বপ্রথমে যোগীন্দ্রনাথই।"[৩২]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮)

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যধারায় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান পরিচয় 'ভোঁদড় বাহাদুর' (১৯৪৬) গল্পের লেখকরূপে। এছাড়াও তাঁর পরিচয় হ'ল তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাইপো আর অবনীন্দ্রনাথের দাদা। ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য-সংস্কৃতিময় পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন তিনি। রঙে, তুলিতে, শব্দে, ভাষায় সেই আভিজাত্যেরই ছোঁয়া মেলে গগনেন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তায়। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে তাঁর অমরকীর্তি 'ভোঁদড় বাহাদুর'। ছোটদের সাহিত্যে এমন মজাদার চমৎকার কাহিনি ও চরিত্র নিতান্তই হাতে গোনা। অবশ্য এই গল্প লেখার প্রেক্ষাপটটিও বেশ মজার। জানা যায়,

> "ঠাকুরবাড়ির ছোটদের পাল্লায় পড়েই একদিন লিখে ফেলেছিলেন এই 'ভোঁদড় বাহাদুর' গল্পটি। তা-ও কি না হাতে লেখা পত্রিকা 'দেয়ালা'র জন্যে। ঠাকুরবাড়ির ছোটদেরই পরিচালনায় প্রকাশ পেত তখন। রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ তো 'দেয়ালা'য় লেখা দিতেন নিয়মিত। কিন্তু ছোটদের জন্যে লেখার যখন আকাল দেখা দিয়েছিল — তখন অবনীন্দ্রনাথই বুদ্ধি খাটালেন ভারি একটা মজার। বললেন, কে কী স্বপ্ন দেখেছে— তাই নিয়েই লিখে দিতে হবে একটা গল্প। বড়দাদাকেও ধরে বসলেন ছোটভাই স্বয়ং। সেই সুবাদেই লেখা হল এই রকম একটা চিরকালীন গল্প —যা কিনা বাংলা শিশুসাহিত্যের সাত রাজার ধন একমানিক।"[৩৩]

এবার গল্পটি একটু সংক্ষেপে বলা যাক্। গল্পটির সূচনা এইরকম —'আজ নবমী পুজোয় পাড়ার মল্লিকবাবুদের বাড়িতে ভয়ানক ধুম! বোমা, দুদমা, ঢাক, ঢোল, সানাই আর তিন দল ইংরেজি বাজনার বেজায় আওয়াজে অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না।' এমনি বিচিত্র বিকট বাদ্যযন্ত্রের মিলিত শব্দে কথক যখন ক্লান্ত, অবসন্ন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন—ঠিক তখনই কাহিনি-মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে গল্পের নায়ক ভোঁদড় বাহাদুরের। যার বাহাদুরির নানান বৈচিত্র্যময় ঘটনা অপূর্ব শব্দে-ভাবে-ভাষায় ও প্রকরণে বর্ণনা করে গেছেন লেখক। জানা যায়, এক ভয়ানক দু'মুখো রাক্ষস ভোঁদড়দাদার কাছে জব্দ হয়ে শেষে তার ছেলে নিচুয়াকে ধরে নিয়ে গেছে বনে। সেই নিচুয়াকে উদ্ধারের অভিযান-কাহিনিই গল্পের মূল আকর্ষণ। ভোঁদড় বাহাদুরের আদেশে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হাজার হাজার ভোঁদড়, বড় বড় কেঁদো বেড়াল, নানারকম খরগোশ আর কাঠবেড়ালি। তাদের নেতৃত্বে আছে ভোঁদড় মহারাজের সেনাপতি 'বকলম' নামের এক হ্যাট-কোট পরিহিত কুকুর। সবার উপরে রয়েছে ভোঁদড়ের অদ্ভুত রকমের এক তাল-বেতালসিদ্ধ লাঠি, যেটা তার আদেশ পাওয়ামাত্র নানা অসম্ভব সব কাণ্ড করে ফেলে। দেখা গেছে, ভোঁদড়ের পরামর্শে গল্পের বৃদ্ধ কথকও 'বিজলে-বউল' খেয়ে নিমেষে তাঁর শৈশব ফিরে পেয়েছেন এবং যোগ দিয়েছেন অভিযানে। অনেক রোমাঞ্চকর পথ পেরিয়ে, চিত্র

বিচিত্র কাণ্ডকারখানার মধ্য দিয়ে একে একে সব প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে শেষ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেছে নিচুয়ার। এরপর নিশ্চিন্তে কথক একটু নিদ্রা যেতেই চাকরের ডাকে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেছে। কাহিনির শেষ এখানেই।

আমরা লক্ষ করি, গল্পটিকে ছোটদের কাছে আন্তরিক ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য লেখক কৌশলে গল্পের বৃদ্ধ কথক চরিত্রটিকে পরিণত করেছেন একটি পাঁচ বছরের বালকে। যার সঙ্গে রাক্ষস-জয়ের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে ছোটদের কোন বাধা নেই। আবার বদ্যিবুড়ো, টিয়ে সাহেব, বুদ্ধিমন্ত, তালপাতার সেপাই, ল্যাজফুলো শেয়াল, টুনটুনি, জোটেবুড়িমা প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখকের বর্ণনার প্রত্যক্ষতায় ছোটদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাশাপাশি তাল-বেতালসিদ্ধ লাঠির হাঁটা-চলা লড়াই করা, মৃত টাটুঘোড়ার সজীব উপস্থিতি, 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' গোছের জাতীয়সঙ্গীত, 'কমলাপুলি প্ল্যাটফর্মে'র স্টেশন ছেড়ে ছুটে চলা ও বেগুন গাছে ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলির চমকপ্রদ উপস্থাপন চিরকালের শিশু-কিশোর সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। ছোটরা কল্পনার এমন বর্ণময় ঘটনাবহুল জগতে ডানা মেলে উড়ে যেতে ভালোবাসে। ভালোবাসে রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানো প্রভৃতি দুষ্ট-শক্তির বিরুদ্ধে বীরপুরুষের মতো লড়াই করতে এবং বিজয়ী হ'তে। সেদিক থেকে 'ভোঁদড় বাহাদুর' গল্পটির আবেদন চিরকালীন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও প্রেরণায় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাইপো। অবশ্য তাঁর রচনায় কোথাও রবীন্দ্র-প্রভাব চোখে পড়ে না। ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক বিচিত্র শিশুজগৎ; যে জগতে কথা, ছবি আর সুরের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে ঐন্দ্রজালিক বাতাবরণ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছোটরা ছুটে যায় সে জগতে। কখনও দেশীয় প্রচলিত লোককথার নবরূপায়ণে, কখনও বিদেশি অনুপ্রেরণার দেশীয় উপস্থাপনে তিনি বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল — লেখা দিয়ে আঁকা নানান মনোহারী ছবি আর ছবি দিয়ে লেখা অপূর্ব গল্পগাথা। "অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ছবি আর লেখা নিয়ে বলেছেন— 'কোন ঠাকুর? ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে।' এই যে ছবি আর লেখার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটানো সেটা আমাদের বাংলা সাহিত্যে বলা যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব অবদান।"[৩৪]

অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের তালিকাটি খুব ছোট নয়। রচনাগুলি প্রকাশের কালানুসারে শকুন্তলা (১৮৯৫), ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনী (১ম খণ্ড ১৯০৯; ২য় খণ্ড ১৯৩১), ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫), নালক (১৯১৬), খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), বুড়ো আংলা (১৯৪১), আলোর ফুলকি (১৯৪৭), হংসনামা পালা (১৯৫১), লম্বকর্ণপালা (১৯৫৪), একে তিন তিনে এক (১৯৫৪), মারুতীর পুঁথি (১৯৫৬), রংবেরং (১৯৫৮), চাঁইবুড়োর পুঁথি (১৯৫৯), কিশোর সঞ্চয়ন (১৯৬০), হানাবাড়ির কারখানা (১৯৬৩), মহাবীরের পুঁথি (১৯৬৬), বাদশাহী গল্প (১৯৭১), স্বপ্নের মোড়ক (২০০০) প্রভৃতি। যদিও রচনাগুলির কয়েকটির প্রকাশকাল

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ মূলত প্রথমার্ধের সাহিত্যিক। তাই আমরা এই পর্বেই সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনাগুলির বিশ্লেষণ করব।

'শকুন্তলা' অবনীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি। কালিদাসের সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের এটি একটি সহজ সুন্দর প্রকাশ। আমরা জানি, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর কাহিনি অবলম্বন করে বাংলায় অনেকেই ভালো ভালো অনুবাদ, ভাবানুবাদ বা অংশ-বিশেষকে নিয়ে অনেক রকম রচনা লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের অনূদিত 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই সমস্ত রচনার মধ্যে অনেকগুলি ছোটদের মতো করে লেখা। অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' এই ধারার একটি সফল প্রয়াস। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা এখানে ধরা পড়েছে। এর ভাষা খুব প্রাঞ্জল। প্রকাশভঙ্গি সহজ অথচ অসাধারণ। খগেন্দ্রনাথ মিত্র এসম্পর্কে বলেছেন —

> "অবনীন্দ্রনাথ মুখের ভাষাকে একেবারে সাহিত্যের আসরে ছড়িয়ে মাতিয়ে দিলেন। তিনি গোটা 'শকুন্তলা'ই লিখলেন মুখের ভাষায়।"[৩৫]

'শকুন্তলা'র ঠিক পরের রচনা 'ক্ষীরের পুতুল'। বাংলার লোকজ রূপকথার কাহিনিকে লেখক এখানে ছোটদের মনের মতো করে পরিবেশন করেছেন। ছোটদের প্রিয় রূপকথার অপরূপ সুরে তিনি বলেছেন এক রাজা আর তাঁর দুই রাণীর কাহিনি। সে রাজার রাজ্যে 'সুওরানী' পায় রাজরাণীর সম্মান ও প্রতিপত্তি; 'দুওরানী'র ভাগ্যে জোটে ছেঁড়া কাঁথা, জীর্ণ শাড়ি আর ভাঙা ঘর। কাহিনির শেষাংশে দেখা যায়, রূপকথার বাঁধাধরা পথেই 'দুওরানী' ফিরে পেলেন তাঁর হারানো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, রাজ্য-রাজৈশ্বর্য আর 'সুওরানী' হিংসেয় বুক ফেটে মরলেন। গল্পটিতে আগাগোড়া রূপকথার পরিচিত আঙ্গিকটি ধরা পড়লেও কাহিনির প্রাণময় বর্ণনার পাশাপাশি রঙবেরঙের ছবির সুন্দর সুষম আয়োজন অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক অবদান। এই 'ক্ষীরের পুতুল'-এই আমরা দেখতে পাই ছোটদের কল্পনার বিচিত্র জগৎটাকে। সে জগতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক ছেলেভুলানো ছড়ার মজার মজার বিষয় ও ঘটনার অভিনব সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সে জগতে 'কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই,পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দীঘির কালো জল, তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ, ... আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন।' [আলোর ফুলকি, ১৯৮০, পৃ: ১৯৫]

এরপর ১৯০৯ সালে প্রকাশ পায় রাজপুতদের বিজয়গাথা অবলম্বনে রচিত 'রাজকাহিনী'-র প্রথম খণ্ড। ১৯৩১ সালে প্রকাশ পায় এর দ্বিতীয় খণ্ড। James Tod-এর 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থের কিছু কিছু কাহিনি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ঐতিহাসিক গল্পগাথা। মেবারের রাজপরিবারের খণ্ড খণ্ড ছবি, বিভিন্ন রাজ-চরিত্রের বিচিত্র জীবনচর্যা, যুদ্ধের রোমাঞ্চকর বর্ণনা— এ সবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'রাজকাহিনী'র বিভিন্ন গল্পে। অন্যদিকে পুরী থেকে কোণারক যাবার পথের নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ভূতপত্রীর দেশ' গল্পটি। এই রচনাটি

তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার রসে সিক্ত সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি। এখানেও অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক কথকতার আমেজটি ফুটে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথের অপর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি হল 'নালক'। গৌতম বুদ্ধের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর সারনাথের তপোবনে আসা পর্যন্ত ঘটনাবহুল জীবনকাহিনি নিয়ে এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। এর কাহিনি-অংশে দেখা যায়, দেবল ঋষির শিষ্য একটি ছোট্ট ছেলে নালক; যে ধ্যানে দেখেছে বুদ্ধের জীবনের নানান ঘটনাধারা — বুদ্ধের জন্ম থেকে শুরু করে সংসার ত্যাগ, মুক্তিলাভের সাধনা, বোধিসত্ত্ব লাভ এবং অশুভশক্তি 'মার'-এর বিরুদ্ধে মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক বুদ্ধের সংগ্রাম। শেষপর্যন্ত "যে 'মার'-এর তেজে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, জল-স্থল-আকাশ— সেই 'মার'-এর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে!" [পৃ: ৫৮] লেখক এখানে ইতিহাসের এক অমর চরিত্র গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনিকে সুন্দর শিল্পরূপ দান করেছেন। রচনাটি সহজতা ও সারল্যের গুণে ছোটদের কাছে পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্ভারের একটা বড় অংশ বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত। যেমন, 'খাতাঞ্চির খাতা'য় রয়েছে James Mathew Barrie (1860-1907)-এর 'Peter Pan' (1904) গল্পের প্রভাব, 'বুড়ো আংলা' গল্পে রয়েছে সুইডেনবাসী লেখিকা Selma Lagerlof (1858-1940)-এর 'The Wonderful Adventures of Niles' (1906)-এর প্রভাব। আবার ফরাসি নাট্যকার Edmond-Eugene Rostand (1868-1918) রচিত Chantecleer (1910) নাটকের গল্পরূপ Florence Yates Hann (?)-কৃত 'The story of Chantecleer' (1913) অবলম্বনে লেখা হয় 'আলোর ফুলকি'। অত্যন্ত সরল ভাষায়, বর্ণনার সরসতায় অবনীন্দ্রনাথ এই সমস্ত বিদেশি সাহিত্যের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে অসাধারণ কৌশলে খাঁটি বাঙালিয়ানা দান করেছেন। ফলে ভিন্‌দেশি গল্পগুলি খুব সহজেই আমাদের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের নিজস্ব প্রাণের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ধরা যাক, 'বুড়ো আংলা' গল্পটির কথা। এ গল্পে 'রিদয়' নামের হৃদয়হীন দুরন্ত যে ছেলেটির ছবি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সে কোনো অচেনা-অজানা চরিত্র নয়, সে চলনে-বলনে, ভাবনা-চিন্তায়, আচরণে একেবারে যেন আমাদের ঘরের ছেলে। এই রিদয়ই একদিন গণেশ ঠাকুরের পিছনে লাগতে গিয়ে তাঁর অভিশাপে পরিণত হয়েছে বুড়ো আংলায়। তারপর গণেশের সন্ধানে এক খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে রিদয় চলেছে কৈলাসের পথে। এই যাত্রাপথের বর্ণনাটি লেখকের ভাষা, কবির কল্পনা আর শিল্পীর তুলির মিশ্রণে হয়ে উঠেছে অপূর্ব প্রাণবন্ত ঃ

> "এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি—অমনি পর-পর কত যে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। তারপর নদীর ধারে এ-নগর, সে-নগর; উপনদীর ধারে সকল উপনগর; তৎপরে এ-ঘাট, ও ঘাট, সে-ঘাট; এ-মাঠ, ও-মাঠ, সে-মাঠ; এ-বন,

ও-বন, সে-বন; তাহার পর উপত্যকা; উপত্যকা বাদ পাহাড়তলী, তৎপরে চিত্রকূট, ত্রিকূট, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথের পাহাড়-পর্বত; তাহার পর বিন্ধ্যাচল, তাহার পর সীমাচল তবে হিমাচল! তৎপরে রামগিরি, তাহার পর ধবলাগিরি, তৎপরে মানস-সরোবর, উহার ওধারে তিব্বত, আরো ওধারে কৈলাস -পর্বত।" [পৃ: ১৭]

এমন বিস্তীর্ণ গ্রাম-নগর, মাঠ-ঘাট, নদী-বন-পাহাড়-পর্বতের অপরূপ শোভা উপভোগ করতে করতে রিদয় পৌঁছে গেছে গণেশ ঠাকুরের কাছে। শেষপর্যন্ত গণেশ-বন্দনায় তাঁকে তুষ্ট করে রিদয় ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব-অবস্থা। গল্পের শেষাংশে রিদয়ের স্বপ্ন, তার কল্পনা আর বাস্তব যেন মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেছে। তাই কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা কৌতূহলে রিদয় তার মাকে প্রশ্ন করে, 'মা, আমি কি সত্যিই বড় হয়ে গেছি?'— 'বুড়ো আংলা' গল্পের মূল কাহিনিতে প্রতিফলিত বিদেশি প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলতে পারি, এখানে কাহিনির মধ্যে যে কাহিনি গড়ে উঠেছে, চরিত্রের অন্তরালে যে চরিত্র ধরা দিয়েছে তা একেবারে অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টিধর্মী স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

অন্যদিকে 'আলোর ফুলকি' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। এ গল্পের আবেদন একদিকে যেমন ছোটদের আনন্দ দেয়, তেমনি তাদের পৌঁছে দেয় এক গভীর সত্যের জগতে। সেখানে দেখা যায়, পাহাড়তলির কুঁকড়োর দৃঢ় বিশ্বাস তার 'আ-লো-র ফুল' ডাকেই পুবের আকাশে ফুটে ওঠে ভোরের আলো। তাই সে বলে, 'আমি না থাকলে পুব আকাশে সব আলো ঘুমিয়ে থাকত .....।' কুঁকড়োর বান্ধবী সোনালি একথা জানতে পেরে একদিন ভোর-রাতে ছল করে নানা মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে কুঁকড়োকে ঢেকে রাখে তার সোনালি ডানায়। তারপর হঠাৎ ডানা সরিয়ে নিয়ে সোনালি বলে উঠল পালক ঝাড়া দিয়ে, 'দেখেছ, কেমন সকাল এসেছে, তুমি না ডাকতেই।' কুঁকড়োর সমস্ত অহঙ্কার টুটে গেল। সে উপলব্ধি করল, 'সত্যিই বলেছ। মন সেও হুকুম মানে, কিন্তু পুবদিক, সে কারু নয়। আজ আমি বুঝেছি কেউ কারু নয়।' — এই উপলব্ধি সর্বজনীন, এই সত্য চিরন্তন। এমন গভীর তত্ত্ব প্রকাশে অবনীন্দ্রনাথ যে সহজ সাবলীল ভাষা-বলয় নির্মাণ করেছেন, তা অসাধারণ।

এই পর্বের অপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'হানাবাড়ির কারখানা'। এটি প্রকাশ পায় অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৬৩ সালে। এই গল্পেও পাশ্চাত্য প্রভাব সুস্পষ্ট। Richard Harris Barham (1788-1845) 'Thomas Ingoldsby' ছদ্মনামে লেখেন অসাধারণ রহস্য-রোমাঞ্চভরা গল্প 'The Ingoldsby Legends of Mirth and Marvels'। অবন ঠাকুর বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য সেই বিদেশি গল্পের ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্ষসকেন্দ্রিক রহস্যময় কাহিনি অবলম্বনে লিখলেন 'হানাবাড়ির কারখানা'। গদ্যের ভাব আর ছন্দের দোলা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এখানে। লেখকের স্বতন্ত্র গল্প বলার মেজাজটিও বেশ আকর্ষণীয়। এমন অনবদ্য গল্প বলার ভঙ্গিটি বাংলা সাহিত্যে বিরল দৃষ্ট। আসলে অবনীন্দ্রনাথ ছোটদের খুব ভালোবাসতেন। তাদের কথা ভাবতেন আন্তরিকভাবে। তাদের মনের জগৎটাকে জানবার চেষ্টা করতেন এবং

তাকেই ফুটিয়ে তুলতেন রেখায় ও লেখায়। নিজের লেখা শিশুসাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> ''যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে 'গল্প বলো', সেই শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা। শিশুসাহিত্য-সম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্য রইল বাঁ হাতের সেলাম; আর ডান হাতের কুর্নিশ রইল তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়া মাদুর নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বকশিশ দিয়ে চলে একটু হাসি কিম্বা একটু কান্না; মানপত্রও নয়, সোনার পদকও নয়; .....।''[৩৬]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন কালজয়ী কথাসাহিত্যিক। বড়দের লেখক হিসাবে তিনি অধিক পরিচিত হলেও বাংলার শিশু-কিশোরদের জন্যেও তিনি সৃষ্টি করে গেছেন অমর কথাসাহিত্য। এ প্রসঙ্গে শ্রীবারিদবরণ ঘোষ বলেছেন,

> ''যাকে বলে ভেবেচিন্তে কিশোরদের জন্যে লিখবো, তেমন কিছু ব্যাপার শরৎচন্দ্র করে যাননি। কিন্তু যাঁরা সমাজের কথা দেশের কথা খুব করে ভাবেন তাঁরা সব বয়সের লোকের কথাই মনে রাখেন। সব ধরনের মানুষের কথা নিয়েই লেখকদের কাজকর্ম। শরৎচন্দ্র সমাজকে নিয়ে বিশেষ করে ভাবতেন। তাই ছোটদের কথা তাঁর লেখাতে অনিবার্যভাবে এসে গেছে।''[৩৭]

সত্যই ছোটদের কথা লিখতে গিয়েও শরৎচন্দ্র ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ ও সপ্রতিভ। সমকালীন যমুনা, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ পায় তাঁর ছোটদের উপযোগী অসাধারণ সব গল্প-উপন্যাস ও স্মৃতিকথাধর্মী রচনাগুলি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল— 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'রামের সুমতি' (১৯১৪), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'মহেশ' (১৯২৬), 'অভাগীর স্বর্গ' (১৯২৬) প্রভৃতি। এরই পাশাপাশি 'লালু', 'ছেলেধরা' প্রভৃতি রচনাগুলি 'ছেলেবেলার গল্প' (১৯৩৮) নামে একটি সচিত্র বইয়ে একসঙ্গে প্রকাশ পায়।

খুব সচেতনভাবে ছোটদের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য হয়তো শরৎচন্দ্রের ছিল না, কিন্তু তাঁর রচনায় ছোটদের একটা বিশেষ স্থান লক্ষ করা যায়। যেখানে বড়দের সমাজে ছোটদের ভূমিকাও কিছু কম নয়। তাদের মানসিক চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, রাগ-অভিমান, অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব এমন গভীরভাবে অন্য কোথাও প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয় না। 'বিন্দুর ছেলে' উপন্যাসের ছোটমার আদরের শান্ত-সরল অমূল্য; 'রামের সুমতি' গল্পের বৌদির আদরের দুরন্ত অথচ সরল-অভিমানী রাম; 'লালু' গল্পের উদ্দাম কিশোর লালু বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অমর হয়ে থাকবে ছোট-বড় সব পাঠকের হৃদয়ে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একজন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। বাংলার শিশু এবং কিশোরদের কথা ভেবে তিনি লিখেছেন বেশ কিছু উৎকৃষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ। যদিও শুধুমাত্র 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) গ্রন্থটির জন্যই তিনি চিরকালের শিশু-কিশোরদের কাছে আদরণীয় হয়ে আছেন। দক্ষিণারঞ্জনই প্রথম বাংলাদেশের পল্লীঅঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন রূপকথা, গীতিকথা, ব্রতকথা ও রসকথাকে সযত্নে যথাযথভাবে সঞ্চয় করে রাখলেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে', 'দাদামশায়ের থলে' সংকলন গ্রন্থে। অবশ্য তার আগে ১৮৮৩ সালে লালবিহারী দে তাঁর বিখ্যাত 'Folk Tales of Bengal' গ্রন্থে বাংলার গ্রামীণ লোকজ গল্পকাহিনিগুলিকে সংগ্রহ করেছিলেন। তবে বইটি লেখা হয় ইংরেজিতে, বাংলায় তার অনুবাদ শুরু হয় দীর্ঘদিন পরে। সেদিক থেকে দক্ষিণারঞ্জনের প্রয়াস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ছোটবেলা থেকেই বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস, জল-মাটি, প্রকৃতি-পরিবেশের অকৃত্রিম স্নেহছায়ায় লালিত হয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। শৈশবে মা-কে হারিয়ে 'বাংলা-মা'-কেই করে নিয়েছিলেন একান্ত আপন। আজীবন সেই মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল অটুট। বাংলা মায়ের আরাধনায় একাত্ম হয়েই উৎসাহী হয়েছিলেন বাংলার সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি উদ্ধারের কাজে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রামবাংলার লোককথাকে, বাংলাদেশের মা-ঠাকুমার অকৃত্রিম সুর ও স্বরকে সংগ্রহ করেছেন দীর্ঘ শ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে। তাঁরই অদম্য প্রচেষ্টায় বাংলার মৌখিক গল্পকাহিনি পেল নাগরিক সাহিত্যের মর্যাদা। এই সমস্ত লোকজ সম্পদ উদ্ধারের পাশাপাশি দক্ষিণারঞ্জন ছোটদের জন্য মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হ'ল— উত্থান (কাব্য) - ১৯০২, ঠাকুরমার ঝুলি - ১৯০৭, না বা আহুতি - ১৯০৮, ঠাকুরদাদার ঝুলি - ১৯০৯, ঠানদিদির থলে - ১৯০৯, খোকাখুকুর খেলা - ১৯০৯, সরল চণ্ডী - ১৯১০, আর্যনারী - প্রথম ভাগ ১৯০৮; দ্বিতীয় ভাগ ১৯১০, চারু ও হারু - ১৯১২, আমার বই - ১৯১২, দাদামশায়ের থলে - ১৯১৩, পূজার কথা - ১৯১৮, ভাদ্র (কাব্য) - ১৯২৭, ফার্স্ট বয় - ১৯২৭, উৎপল ও রবি - ১৯২৮, কিশোরদের মন - ১৯৩৩, কর্মের মূর্তি - ১৯৩৩, বাংলার সোনার ছেলে - ১৯৩৫, সবুজ লেখা - ১৯৩৮, লাস্ট বয় - (১৯৪৫, ২য় সংস্করণ), চিরদিনের রূপকথা - ১৯৪৭, আমার দেশ - ১৯৪৮, আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী - ১৯৪৮ প্রভৃতি।

সমকালীন বিখ্যাত প্রদীপ, প্রকৃতি, ভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় দক্ষিণারঞ্জনের বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশ পায়। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন প্রগতিবাদী সংস্থা-সংগঠনের সঙ্গে। 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ', 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি' প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকেছেন। আবার 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'-এর মুখপত্র 'পথ'-এর প্রদর্শক-সম্পাদকরূপে তিনি অনেক সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা লিখে গেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের এমন অমর কীর্তির কথা স্মরণ করে 'দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র'-এর সংকলক শ্রীপ্রবীর ঘোষ বলেছেন —

> ''রূপকথার সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন বাংলার লোক-সাহিত্য পুনরুদ্ধারের জন্য আজীবন যে সাধনা করে গেছেন তার জন্য বাংলা সাহিত্যের জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন একাধারে গবেষক, শিশু-সাহিত্যিক, গীতিকার, কবি, রস-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার।''[৩৮]

দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি 'ঠাকুরমার ঝুলি'। যার মধ্যে আমরা রূপকথার বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ লক্ষ করি। যেমন, 'দুধের সাগর'-অংশে রয়েছে কলাবতী রাজকন্যা, ঘুমন্তপুরী, কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা, সাত ভাই চম্পা, শীত-বসন্ত ও কিরণমালার গল্প; 'রূপতরাসী'-অংশে রয়েছে নীলকমল আর লালকমল, ডালিমকুমার, পাতাল-কন্যা মণিমালা, সোনার কাঠি রূপার কাঠির গল্প; 'চ্যাঁ-ব্যাঁ'-অংশে রয়েছে শিয়াল পণ্ডিত, সুখু আর দুখু, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, দেড় আঙ্গুলে; আর 'আম-সন্দেশ'-অংশে আছে তিনটি লোকজ কবিতা — সোনা ঘুমাল, শেষ, ফুরাল। গল্পগুলির রোমাঞ্চকর সরস আবেদন ছোটদের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে, কাঞ্চনমালা, সাত ভাই চম্পা, নীলকমল আর লালকমল, ডালিমকুমার, শিয়াল পণ্ডিত গল্পগুলি দক্ষিণারঞ্জনের পরিবেশনার গুণে অমর হয়ে আছে। বইটিতে মুদ্রিত ছবিগুলি এঁকেছিলেন গ্রন্থকার নিজেই। বইটির গ্রন্থনা, অলঙ্করণ, মুদ্রণ সবই ছিল বেশ পরিপাটি। সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ভারতী, প্রবাসী, সন্ধ্যা, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, বসুমতী প্রভৃতিতে 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। অন্যদিকে শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষসহ আরো অনেকে গ্রন্থটি সম্পর্কে সপ্রশংস অভিমত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাগ্রহে গ্রন্থটির ভূমিকা রচনা করে দিয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের প্রশংসায় তিনি লিখেছেন,

> ''যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, ... নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত। ..... দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।''[৩৯]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র পর পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে', 'দাদামশায়ের থলে' প্রভৃতি লোকসাহিত্যের সংকলন গ্রন্থগুলি। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-র অন্তর্গত মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা— এই গল্পগুলি ছোটদের পৌঁছে দেয় রূপকথার মোহময়-মায়াময় জগতে। যে জগতের রাজকন্যার দুঃখ ছোটদের ব্যথিত করে। রাজপুত্রের বীরত্ব ও বিজয় তাদের আনন্দ দেয়, সাহস জোগায়। অন্যদিকে 'দাদামশায়ের থলে' নির্ভেজাল হাস্যরস আর আনন্দরসের ভাণ্ডার। এর হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী, নূতন জামাই, বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান প্রভৃতি গল্পগুলি সকলকেই মজা দেয়।

বাংলার শিশুদের জন্য দক্ষিণারঞ্জন যেমন লিখেছেন 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতি অমর সংকলন গ্রন্থগুলি, তেমনি কিশোরদের মনের খিদে মেটাতে তিনি লিখেছেন বেশ কিছু মৌলিক গল্প ও উপন্যাস। এই মৌলিক সৃষ্টির জগতেও দক্ষিণারঞ্জনের রচনারীতির নৈপুণ্য চোখে পড়ে। যেখানে সমকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনের নানান সুখ-দুঃখ, সমস্যা-সঙ্কট, সঙ্গতি-অসঙ্গতির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। দক্ষিণারঞ্জনের উল্লেখযোগ্য রচনা 'চারু ও হারু' নামক কিশোর উপন্যাসটি। এটি প্রথম ঢাকার 'তোষিণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। উপন্যাসে দেখা যায়, চারু জমিদারের ছেলে। অর্থ-সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যসামগ্রী কোনোকিছুরই অভাব নেই তার। অন্যদিকে হারু দরিদ্র কৃষকের ছেলে; অভাব আর দুর্দশাকে অবলম্বন করেই বেড়ে উঠেছে সে। অথচ স্বভাব-চরিত্রে, লেখাপড়ায়, আচার-আচরণে হারু চারুর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক পরিণত। তাই উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায়, নানা কুসঙ্গে পড়ে চারু যখন পরীক্ষায় খারাপ ফল করেছে, তখন হারু জিতে নেয় সর্বসেরার সম্মান। লেখক এখানে সহজ ভাষায় সমাজের ভালোমন্দ দিকগুলিকে তুলে ধরে কিশোর পাঠকদের যথার্থ চরিত্র, মন ও মনন গঠনে সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে 'উৎপল ও রবি' উপন্যাসটি একই পটভূমিতে লেখা হলেও এখানে জমিদারের ছেলে উৎপল ও দরিদ্র বিধবার ছেলে রবির মধ্যে গড়ে উঠেছে অভিন্ন-হৃদয় মিত্রতা। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল তাদের বন্ধুত্বের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই বন্ধুর বিচ্ছেদ বেদনার কারুণ্যে শেষ হয়েছে উপন্যাসটি। যার গভীর আবেদন পাঠকমন ছুঁয়ে যায়। এছাড়াও রয়েছে 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়', 'কিশোরদের মন' প্রভৃতি রচনাগুলি। শুধু সমাজসচেতনতা নয়, লেখক এখানে স্বদেশপ্রেমের বাণীও প্রচার করেছেন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষাপটে। 'না বা আহুতি', 'খোকাখুকুর খেলা', 'আমার দেশ' প্রভৃতি রচনায় তিনি উচ্চারণ করেছেন স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র।

কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০)

উপেন্দ্রকিশোরের ভাই ও সুকুমার রায়ের কাকা কুলদারঞ্জন রায় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে একটি সুপরিচিত নাম। উপেন্দ্রকিশোরের উৎসাহেই তাঁর এ জগতে আসা। তিনি একদিকে যেমন ভারতীয় পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, রামায়ণ প্রভৃতি কাহিনিকে ছোটদের মনের মতো করে পরিবেশন করেছেন, তেমনি বেশ কিছু বিদেশি শিশু-কিশোর উপযোগী রচনারও বাংলা অনুবাদ করেছেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর এ সমস্ত রচনা প্রকাশ পেত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হ'ল— রবিনহুড (১৯১৪), ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৯১৭), ইলিয়াড (১৯২১), ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র (১৯২২), কথাসরিৎসাগরের গল্প (১৯২৭), আশ্চর্য দ্বীপ (১৯৩০), ছেলেদের গল্প (১৯৩২), ছোটদের পুরাণের গল্প (১৯৫৫) প্রভৃতি।

কুলদারঞ্জনের গল্প বলার একটা নিজস্ব সুন্দর স্টাইল ছিল। যার ফলে দেশি বিদেশি যে কোনো কাহিনিই তাঁর হাতে একটা অনন্য মাত্রা লাভ করেছে। অত্যন্ত সরল বাক্যে, সহজ উপস্থাপনায় তিনি ছোটদের মনের মতো করে গল্পকাহিনিকে পরিবেশন করতে পারতেন। ছোটদের জন্য তিনি কোনো মৌলিক সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর অনুবাদ রচনাগুলি অনেকক্ষেত্রেই ভাষাভঙ্গির ঋজুতায় ও প্রাঞ্জলতায় মৌলিক

সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। সাধু ও চলিত গদ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগে বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদগুলিও বেশ সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। তাছাড়া 'রবিনহুড', 'ইলিয়াড', 'আশ্চর্য দ্বীপ' প্রভৃতি গল্পের অনুবাদের মধ্য দিয়ে কুলদারঞ্জন বাংলার কিশোরদের আনন্দদানের পাশাপাশি তাদের মনে শক্তি এবং সাহস সঞ্চার করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে, 'আশ্চর্য দ্বীপ' রচনাটি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। বিখ্যাত ফরাসি লেখক জুল ভার্ণ (১৮২৪-১৯০৫)-এর প্রসিদ্ধ রোমাঞ্চপূর্ণ উপন্যাসত্রয়ী 'Abandoned', 'The Mysterious Island', 'The Mystery of the Island' (1874) অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচিত। এ সমস্ত অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার কিশোর-কিশোরীদের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করেছেন।

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় সংঘটিত 'ওয়ার অব্ সেসেসন'-এর পটভূমিতে 'আশ্চর্য দ্বীপ'-এর কাহিনি লেখা হয়েছে। আমেরিকার অধিবাসীদের দু'টি দলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় বহু মানুষ রিচ্‌মণ্ড শহরে শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েন। ক্যাপ্টেন্ সাইরাস হার্ডিং-এর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল সেখান থেকে পালাবার পরিকল্পনা করেন। প্রবল ঝড়ের রাতে একটি বেলুনে চড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁরা পৌঁছলেন এক আশ্চর্য দ্বীপে। সেখানে প্রায় দিনই ঘটতে থাকে রহস্য-রোমাঞ্চভরা আশ্চর্য সব ঘটনা। শেষে সমস্ত রহস্যের অবসানে কাহিনির পরিসমাপ্তি। আশ্চর্য দ্বীপে অসহায় পাঁচজন মানুষ কীভাবে বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অসম শক্তি ও সাহসের সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। যা ছোটদের মনে শক্তি ও সাহস জোগায়। তাদের রোমাঞ্চিত করে আবার তাদের মনে বিজ্ঞানচেতনাও গড়ে তোলে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৫)

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অবদান অনেক। বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়-সম্ভারে তিনি ছোটদের জন্য গড়ে তুলেছেন একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের জগৎ। ছোটদের চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশের কথা ভেবে তিনি সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র-নির্ভর বহু গল্পকাহিনি। এছাড়াও পুরাণ, রূপকথা, জীবনী, শিকারকাহিনি, ভ্রমণ, ডাকাতের গল্প সব মিলে প্রায় ৫৫/৫৬টি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। শিশুসাথী, রামধনু প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশ পায়। 'কৈশোরক' (১৯৩৭) নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ পায় তাঁরই সম্পাদনায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হ'ল — ডালি (১৯১০), প্রহ্লাদ (১৯১৩), বর্তমান জগৎ (১৯১৪), অর্জুন (১৯১৫), ছেলেদের হিন্দুস্থান (১৯২২), গুরুগোবিন্দ সিং (১৯২৩), রাণী দুর্গাবতী (১৯২৩), স্যার রাসবিহারী (১৯২৩), আদিম জগৎ (১৯২৪), অহল্যা বাঈ (১৯২৪), ছেলেদের বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯২৫), বিদ্যাসাগর (১৯২৬), অজানা দেশে (১৯৩৪), নীলনদের দেশে (১৯৩৫), বালক কেশব (১৯৩৮), যারা ছিল দিগ্বিজয়ী (১৯৪৫), শিশুভারতী (দশ খণ্ড-১৯৪৭; সংযোজনী খণ্ড-১৯৬৩), ঝাঁসীর রাণী (১৯৪৮), গল্প সঞ্চয়ন (১৯৫৫), বাঙলার ডাকাত (১ম খণ্ড-১৯৫৫; ২য় খণ্ড-১৯৫৮, ৩য় খণ্ড-১৯৭৫; ৪র্থ খণ্ড-১৯৭৭), সুন্দরবনের চিঠি (১৯৫৬), রূপকথার দেশে (১৯৫৯) প্রভৃতি।

ছোটদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক কোষগ্রন্থ 'শিশুভারতী'র সম্পাদনা যোগেন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। এছাড়া দেশের ইতিহাস সম্পর্কে ছোটদের জানাবার জন্য তিনি যেমন লিখেছেন 'ছেলেদের হিন্দুস্থান', 'ছেলেদের বাঙ্গালার ইতিহাস', তেমনি 'পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে'- সিরিজে আমরা পাই 'ইংলন্ড' (১৯২৩), 'রোম' (১৯২৩), 'আরব' (১৯২৪) 'ইটালী' (১৯২৪), 'আমেরিকা' (১৯২৫) প্রভৃতি দেশের সুন্দর সুবিস্তৃত বিবরণ। এ সমস্ত গ্রন্থ ছোটদের দেশ-বিদেশের নানান অজানা তথ্যের সন্ধান দেয়। এই ইতিহাস অনুসন্ধান করতে করতেই যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন বহু ইতিহাস-খ্যাত মানুষের বিচিত্র জীবনকাহিনি। ছোটদের চরিত্রগঠনের আদর্শস্বরূপ এই রচনাগুলির মূল্য অসাধারণ। আবার এর পাশাপাশি লিখেছেন ইতিহাসের কুখ্যাত ভয়ঙ্কর 'ডাকাত'-চরিত্র অবলম্বনে 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থটি। লক্ষ করার বিষয়, লেখক তথাকথিত হিংস্র, অত্যাচারী ডাকাত চরিত্রগুলির অন্তরে সংগুপ্ত সরল, কোমল মানবিক দিকগুলিকে এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই চরিত্রগুলির সাহসিকতা, মানবিকতা, স্বদেশচেতনা ছোটদের মনে স্বাদেশিকতা, সাহসিকতা সঞ্চার করে। 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থটি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একটি বিশিষ্ট রচনা। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যোগেন্দ্রনাথের অনুবাদমূলক রচনাদু'টিও অসাধারণ। 'অজানার দেশে' গল্পটি লেখা হয় Robert Paltock-এর 'Peter Wilkins' অবলম্বনে আর 'নীলনদের দেশে' গল্পটি লেখা হয় William Charles Baldwin-এর 'African Hunting' গ্রন্থ অবলম্বনে। 'নীলনদের দেশে' একটি দুর্দান্ত শিকারের কাহিনি। তবে আফ্রিকার গহন অরণ্যে বিভিন্ন হিংস্র জন্তু শিকারের রোমাঞ্চকর বর্ণনার পাশাপাশি এখানে লেখকের প্রথম জীবনের সংক্ষিপ্ত কথা, তাঁর শিকারের নেশা, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা, কাফ্রিদের পল্লী-ব্যবস্থা, তাদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির অনুপুঙ্খ বিবরণও স্থান পেয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ এমন একটি লোমহর্ষ শিকার কাহিনির অনুবাদে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছোট ছোট বাক্যে, উপযুক্ত শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে তিনি বিদেশি কাহিনির টান টান উত্তেজনাকে সার্থকভাবে রক্ষা করে গেছেন। গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন,

> "কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া বালডুইন সাহেব আফ্রিকার নানাস্থানে শিকার করিয়াছেন, নূতন নূতন দেশ দেখিয়াছেন, নানা দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতির সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং সে সকলের তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই ডায়ারি বা দৈনন্দিন-লিপি লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক এবং অসাধারণ সাহসের পরিচায়ক। ..... আমাদের বালকবালিকাগণের উপযোগী করিয়া আমি এই শিকার ও ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এইরূপ দুঃসাহসিকতার কাহিনী পড়িয়া বালকবালিকাগণ আনন্দ ও শিক্ষা দুইই লাভ করিবে এবং প্রকৃত মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষাও তাহাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে।"[৪০]

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯)

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে সুখলতা রাও-এর অবদান অসামান্য। ছোটদের রুচিশীল মন ও মনন গঠনে তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তিনি তাঁর রচনায় ছোটদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ছোটদের নির্মল মজা আর আনন্দদানের পাশাপাশি তাদের মনের উপযুক্ত বিকাশের দিকেও সুখলতার সমান দৃষ্টি ছিল। বিশেষ করে, প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় নিয়ম-নিষ্ঠা, রুচিপূর্ণ আচার-আচরণ, ভালোমন্দ বোধ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে চেতনা প্রভৃতি বিষয়কে ছোটদের কাছে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করেছেন লেখিকা। গল্প, নাটক, উপন্যাস, ছড়া, কবিতা, গান আর বিচিত্র পাঠ্যবইয়ের সমবায়ে তাঁর সাহিত্যসম্ভার সুসমৃদ্ধ। সেকালের বিখ্যাত প্রবাসী, ভারতী, সন্দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর রচনা প্রকাশ পেত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হ'ল — গল্পের বই (১৯১২), আরো গল্প (১৯১৫), পড়াশুনা (১৯২১), নূতন পড়া-প্রথম ভাগ (১৯২২), স্বাস্থ্য (১৯২৫), নতুন ছড়া (১৯৫২), নিজে পড় (১৯৫৬), নিজে শেখ (১৯৫৭), আলি ভুলির দেশে (১৯৫৭), নানান গল্প (১৯৬০), খেলার পড়া (১৯৬১) খোকা এল বেড়িয়ে (১৯৬১), বিদেশি ছড়া (১৯৬২), ঈশপের গল্প (১৯৬৩), নানান দেশের রূপকথা (১৯৬৪), বনে ভাই কত মজাই (১৯৬৪), হিতোপদেশের গল্প (১৯৬৫), কিশোর গ্রন্থাবলী (১৯৬৬), নূতনতর গল্প (১৯৬৯) প্রভৃতি। দেখা যাচ্ছে, ১৯১২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে সুখলতার বিভিন্ন রচনা প্রকাশ পায়। আমরা ১৯৫০ সালের পরে প্রকাশিত রচনাগুলি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

বাংলার শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বেশ কিছু গল্প-কবিতা রচনা করেছেন সুখলতা। লোকজ ছড়ার পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বহু রূপকথার গল্পেরও সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন তিনি। 'গল্পের বই' এবং 'আরো গল্প' বই দু'টি এই পর্যায়ের সুন্দর নিদর্শন। বই দু'টি পরে 'গল্প আর গল্প' নামক গ্রন্থে একত্রে সংকলিত হয়েছে। 'গল্পের বই'-এ আছে মোট কুড়িটি দেশীয় রূপকথার গল্প। এই বইয়ের ব্যাঙ রাজা, নেক্‌ড়ে ও ছাগলছানা, গরিব মুচি, ঘুমের দেশে, সোনার হাঁস গল্পগুলি অসাধারণ। লেখিকা নিজেই এই সমস্ত গল্পের বিষয় ও ভাবের সামঞ্জস্যে সুন্দর সুন্দর মনোহারী ছবি এঁকেছেন। ফলে ছবির আকর্ষণে আর গল্পের যাদুতে সম্পূর্ণ বইটি ছোটদের কাছে বিশেষ গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। 'আরো গল্প' বইটিও বিচিত্র স্বাদের দেশীয় রূপকথার একটি সুন্দর সংকলন। মোট পনেরোটি গল্প স্থান পেয়েছে এখানে। রয়েছে সুখলতার আঁকা বেশ কিছু ছবিও। এ গ্রন্থের বোতলের ভূত, রাজা নাকেশ্বর, দুষ্ট বিড়াল, বামন বুড়ো, তিনবন্ধু প্রভৃতি গল্পগুলির বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপন ছোটদের মুগ্ধ করে। তাদের আনন্দ দেয়।

এছাড়াও শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন সুখলতা। 'পড়াশুনা', 'নূতন পড়া' প্রভৃতি বইগুলি শিশুর বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠরূপে স্বীকৃত। আবার শিশুর মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের উপযুক্ত বিকাশের কথা চিন্তা করে সুখলতা লিখেছেন 'স্বাস্থ্য' নামক বইটি। সুন্দর ছবি আর মজার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার নানান পন্থা নির্দেশ করেছেন। সুখলতার সবচেয়ে বড় গুণ হ'ল— তিনি যে কোনো বিষয়কে সহজ ভাষায়, সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে পারতেন। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সৎপথে, শুভবোধ ও মহৎ আদর্শের পথে চালিত করার কাজেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অন্যতম যোগ্য উত্তরসূরী হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার রায়। বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁর অসাধারণ অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। হাসি, মজা আর কৌতুকের অপূর্ব পরিবেশনায় তিনি রাঙিয়ে তুলেছেন বাঙালির শৈশব-কৈশোর। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনাকালে সুকুমারের শিল্পী-প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটে। অবশ্য তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনা হয় 'মুকুল' পত্রিকায়, ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'নদী' কবিতাটির মাধ্যমে। তখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর। ঠিক তার পরের বছর 'মুকুল'-এই প্রকাশ পায় সুকুমারের দ্বিতীয় রচনা 'টিক টিক টিং' নামক কবিতাটি। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে 'সন্দেশ'-এর পাতায় প্রকাশ পায় তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও গদ্য রচনা। আরো পরে অর্থাৎ ১৯১৫ সাল থেকে একের পর এক গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক, প্রবন্ধ লিখে যান সুকুমার। চিত্রকর সুকুমারেরও সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটে এই সময়। তাঁর সেইসব অমর রচনাগুলির মধ্যে 'আবোল-তাবোল' (১৯২৩), 'হ য ব র ল' (১৯২৪), 'পাগলা দাশু' (১৯৪০), 'ঝালাপালা' (১৯৪৪), 'খাই খাই' (১৯৫০) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

রায় পরিবারের সাহিত্য-সংস্কৃতিমুখর পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন সুকুমার। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা যথার্থভাবেই রক্ষা করতে পেরেছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিক্ষমতা। তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন বিষয়ের সূত্র ধরে মজার মজার গল্পকাহিনি বানিয়ে ফেলার বিরল প্রতিভা ছিল তাঁর। বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৯০-১৯৭৪) তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিচারণায় বলেছেন,

> "ছোটবেলা থেকেই দাদাও চমৎকার গল্প বলতে পারত। বাবার প্রকাণ্ড একটা বই থেকে নানান জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে টুনি মনি আর আমাকে অনেক আশ্চর্য আর মজার গল্প বলত। বইয়ের গল্প ছাড়াও নিজের মনগড়া কত অদ্ভুত জীবের গল্প—মোটা 'ভবন্দোলা' কেমন দুলে দুলে থপথপিয়ে চলে, 'মস্ত পাইন' তার সরু লম্বা গলাটা কেমন পেঁচিয়ে গিঁট পাকিয়ে রাখে, গোলমুখো ড্যাবাচোখা 'কোম্পু' অন্ধকার বারান্দার কোণে, দেওয়ালের পেরেকে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে। এখন যেমন তোমরা 'কুমড়োপটাস্', 'রামগরুড়', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'—এদের গল্প শুনে আমোদ পাও, আমরাও তখন ওই সব অদ্ভুত জীবের গল্প শুনে আমোদ পেতাম।"[৪১]

এমনই অদ্ভুত মজার মজার বিষয় আর বাঁধভাঙা হাসির উপহার নিয়ে সুকুমার হাজির হয়েছেন ছোটদের মনের জগতে। লিখেছেন বহু গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এঁকেছেন বিষয়োপযোগী মজার মজার ছবিও। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের চিরাচরিত রূপকথা উপকথার রহস্য-রোমাঞ্চভরা কল্পনার জগৎকে পিছনে ফেলে তিনি সৃষ্টি করলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক আজব জগৎ। যে জগতের সমস্ত অসম্ভব কর্মকাণ্ডেও রয়েছে আশ্চর্য এক সম্ভাব্যতা। সে জগতে রয়েছে দাশুর দুষ্টুমিভরা পাগলামি। আবোল তাবোলের রকমারি 'খেয়াল খোলা স্বপন দোলা'। হ য ব র ল জগতে হিজি বিজ্ বিজ্-এর বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ। এ সবই সুকুমারের

হাস্যরসিক পরিহাসপ্রিয় খামখেয়ালি মনটিকে চিনতে সাহায্য করে। অবশ্য সুকুমার এমন বিচিত্র জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের দুই প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিকের কাছ থেকে। একদিকে Edward Lear (1832-1898)-সৃষ্ট আপাত আজগুবি লিমেরিকের জগৎ, অন্যদিকে Lewis Carroll (1822-1888) রচিত 'Alice'-এর আশ্চর্য এক স্বপ্ন-জগৎ। এই দুই-এর মেলবন্ধনে সুকুমার সৃষ্টি করলেন একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব বিস্ময়রস উজ্জীবনের অভিনব জগৎ। এই প্রেরণার কথা স্বীকার করে নিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) বলেছেন —

> "..... সে প্রেরণা অনুকরণের এমন কি অনুরণনেরও নয়। সে প্রেরণা দূর থেকে কারও বাঁশি শুধু বাজানো শুনে নিজের উদ্ভাবনে যেন বাঁশের নল থেকে বাঁশি তৈরী করে ফেলা। সুকুমার রায় লিয়র-এর লিমেরিক আর ক্যারলের আজব দেশে অ্যালিস ও জ্যাবারওয়াকি-র মত কবিতা পড়েছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু তা পড়ে তিনি নিজে যে 'আবোল তাবোল', 'দ্রীঘাংচু', 'হ-য-ব-র-ল', 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' কি 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী' লিখেছেন তা এই বাংলার মন প্রাণ মাটি জল দিয়ে গড়া একেবারে খাঁটি স্বদেশী জিনিষ।"[৪২]

বলা যায়, লিয়র এবং ক্যারলের সাহিত্যচর্চার অভিনব মজার আঙ্গিকের সঙ্গে সুকুমার তাঁর আপন প্রতিভা ও সরস শিল্পকলার সমন্বয়ে গড়ে তুলেছেন একটা স্বতন্ত্র 'ননসেন্স জগৎ'। সে জগতের অভ্যন্তরে সমকালীন রাষ্ট্রভাবনা বা সমাজচিন্তা যেভাবেই প্রতিফলিত হোক না কেন, তার সবটাই ঢাকা পড়ে গেছে হাস্যকৌতুকের উজ্জ্বল আবরণে। শিল্পসৃষ্টিই সেখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে সৃষ্টি ভারহীন, প্রাঞ্জল, নির্মল আনন্দদায়ী। তাই ছোটদের কাছে তার আবেদন চিরকালীন। সেখানে সমস্ত অস্বাভাবিকতার মধ্যেও ছোটরা খুঁজে পায় অনাবিল হাসি আর মজা ভরা গভীর বিশ্বাসের জগৎ।

সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' উদ্ভট কল্পনার সমাহারে সমৃদ্ধ এক নির্মল হাস্যরসের ভাণ্ডার। বিচিত্র স্বাদের কবিতা রয়েছে এখানে। ছোটরা বড় হয়েও ভুলতে পারে না সেইসব কবিতার এক-একটি দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্র। তারা ভুলতে পারে না কাতুকুতু বুড়োর কথা। হেড অফিসের বড়বাবুর 'গোঁফচুরি'র হুলুস্থুল কাণ্ডকারখানার কথা। তারা মজা পায় কুমড়ো পটাশ, হাঁসজারু, বকচ্ছপ, ট্যাঁশ গরু প্রভৃতি কিম্ভূত কিমাকার মজারু জন্তু-জানোয়ারের রকম-সকম দেখে। হুঁকোমুখো হ্যাংলা বা বোম্বাগড়ের রাজার অদ্ভুত রীতিনীতির কথাও কি ভোলা যায়! সেখানে —

> "কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—
> ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
>
> .....
>
> রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুঁকোর মালা প'রে?
> এমন কেন ঘটছে তা কেউ বলতে পার মোরে?" ['বোম্বাগড়ের রাজা', পৃ: ২২]

'হ য ব র ল'-এর জগৎটাই আবার ভেল্‌কি লাগা। তাই বুঝি গল্পের শুরুতেই দেখা যায় — 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল!' ছোটরা গল্পের প্রথমেই এমন মজাদার ঘটনা দেখে অদম্য কৌতূহলে পড়ে ফেলে সবটা। বিশেষ করে, শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচের গোলমেলে অঙ্কের হিসেব শুনে আর হিজি বিজ্‌ বিজ্‌-এর অকারণ হাসির রেশ ধরে ছোটরাও খিলখিল করে হেসে ওঠে। এমন অনাবিল হাসি আর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আছে বলেই ছোটদের কাছে 'হ য ব র ল'-এর জগৎটা এত প্রিয়, এত আকর্ষণীয়।

অন্যদিকে 'পাগলা দাশু' চিরন্তন কিশোর-প্রাণের অমূল্য সম্পদ। দাশু চরিত্রের সরলতাভরা দুষ্টুমি ছোট-বড় সকলকেই মুগ্ধ করে, আকৃষ্ট করে। তার নিত্যনতুন দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ স্কুলের শিক্ষকসহ অন্যান্য সহপাঠীরা। তার চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন —' ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারী .....।' এই ভারী মুণ্ডু থেকেই বেরিয়ে আসে আশ্চর্য বুদ্ধিভরা এক-একটি নতুন নতুন পাগলামি। কখনো সে স্কুলে একটা চাবি দেওয়া বাক্স এনে বন্ধুদের কৌতূহলী করে তোলে এবং শেষে তাদের বোকা বানায়; আবার কখনো স্কুলে চীনে পট্‌কা নিয়ে গিয়ে সমস্ত ক্লাস ভণ্ডুল করে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শত দোষ করেও দাশু ছাড়া পেয়ে যায় 'পাগলা' বলে। বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এই গল্পগুলির আবেদন কোনদিনই ম্লান হবার নয়।

এছাড়াও সুকুমার সাহিত্যসম্ভারে রয়েছে 'খাই খাই'-এর সুস্বাদু কবিতাবলী, 'হেশোরাম হুঁশিয়ার'-এর আজব শিকার-কাহিনিতে ভরা ডায়েরি, দেশবিদেশের মজার মজার গল্প, জীবনী, নিবন্ধ, আরো কত কী! রয়েছে 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'অবাক জলপান'-এর মতো সুন্দর ও উৎকৃষ্ট ছোটদের নাটক।

ছোটদের সাহিত্যের ইতিহাসে সুকুমার রায়ের রচনাগুলি একেবারেই ভিন্ন স্বাদের, স্বতন্ত্র ধারার শিল্পসৃষ্টি। তাঁর সৃষ্ট শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগৎ অনেকটাই পরিণত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। মনে হয়, তাঁর রচনা পড়ে ছোটরা মজা পাবে। আনন্দ পাবে। শব্দ-ছন্দের দোলায় দুলবে। কিন্তু সেখানে আপাত উদ্ভট কল্পনার মধ্যে যে গভীর জীবনদর্শন রয়েছে, তা বড়দের বুদ্ধির জগৎকেই নাড়া দেবে। সাহিত্যবোধ, শিল্পচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজভাবনা, রঙ্গরসিকতা যেন মিলেমিশে গেছে সুকুমারের বিচিত্র চিত্রময় সৃষ্টিজগতে। তাই ছোটদের সমাজে তাঁর আবেদন যতখানি হাল্‌কা আমোদের, বড়দের আসরে তাঁর উপস্থিতি ততটাই বিস্ময়জাত গাম্ভীর্যের।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩)

বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। ১৯০৩ সালে 'বসুধা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'আমার কাহিনী' প্রকাশ পায়। তিনি মূলত বড়দের লেখক। দীর্ঘদিন ভারতী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য বড়দের পাশাপাশি ছোটদের উপযোগী গল্প, উপন্যাসও কম লেখেন নি। শুধু ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গ্রন্থ সংখ্যাই প্রায় শতাধিক। রহস্যে-রোমাঞ্চে ভরা গল্পকাহিনিগুলি ছোটদের কাছে দারুণ সমাদৃত। লিখেছেন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, গোয়েন্দা কাহিনি, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূতের গল্প, হাসির গল্প, ভ্রমণমূলক রচনা, আরো কত কী। সেসময়ের অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। 'রংমশাল', 'নাচঘর' প্রভৃতি

পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি চিত্রকলারও অনুশীলন করেছেন তিনি। ছিলেন সুগায়ক। বাংলা গানের জগতেও গায়ক, গীতিকার রূপে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন।

হেমেন্দ্রকুমারের ছোটদের রচনাগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য অসাধারণ। তিনি ছোটদের প্রিয় রহস্য-রোমাঞ্চ, ভূত-প্রেত প্রভৃতি বিষয়কে নিপুণভাবে তাঁর রচনায় স্থান দিয়েছেন। তাঁর রোমহর্ষক ভূতের গল্প, গোয়েন্দা গল্পগুলি অবশ্য ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও আকর্ষণ করে, আনন্দ দেয়। এই সমস্ত রচনার অধিকাংশই বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত। যদিও হেমেন্দ্রকুমারের রচনার গুণে এবং উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে গল্প-উপন্যাসগুলি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর বিশেষ বিশেষ বইগুলির তালিকা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হ'ল— মায়াকানন (১৯২৩), বিজয়া (১৯২৯), ময়নামতীর মায়াকানন (১৯৩০), যকের ধন (১৯৩০), যাদের নামে সবাই ভয় পায় (১৯৩২), মেঘদূতের মর্তে আগমন (১৯৩৩), আবার যকের ধন (১৯৩৩), আজব দেশে অমলা (১৯৩৪), কিং কঙ (১৯৩৪), মানুষের গন্ধ পাই (১৯৩৪), সন্ধ্যার পরে সাবধান (১৯৩৪), অদৃশ্য মানুষ (১৯৩৫), অমানুষিক মানুষ (১৯৩৫), হিমালয়ের ভয়ঙ্কর (১৯৩৫), রক্ত-বাদল ঝরে (১৯৩৬), জয়ন্তের কীর্তি (১৯৩৭), অসম্ভবের দেশ (১৯৩৭), পদ্মরাগ বুদ্ধ (১৯৩৮), অমাবস্যার রাত (১৯৩৯), ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন (১৯৩৯), মড়ার মৃত্যু (১৯৩৯), মানুষ পিশাচ (১৯৩৯), মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার (১৯৩৯), অমৃত দ্বীপ (১৯৪০), ছায়া-কায়া মায়াপুরে (১৯৪০), আধুনিক রবিনহুড (১৯৪০), অন্ধকারের বন্ধু (১৯৪১), ভয় দেখানো ভয়ানক (১৯৪১), জেরিনার কণ্ঠহার (১৯৪১), ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে (১৯৪১), মুখ আর মুখোস (১৯৪২), ভূত আর অদ্ভুত (১৯৪৩), যশপতির রত্নপুরী (১৯৪৩), সূর্য নগরীর গুপ্তধন (১৯৪৪), মধুছত্র (১৯৪৪), মানুষের গড়া দৈত্য (১৯৪৪), রহস্যের আলোছায়া (১৯৪৪), তারা তিন বন্ধু (১৯৪৫), বজ্রভৈরবের গল্প (১৯৪৬), দেড়'শ খোকার কাণ্ড (১৯৪৭), মোহন মেলা (১৯৪৭, সংকলন), ভগবানের চাবুক (১৯৪৭), সুন্দরবনের রক্তপাগল (১৯৪৭), হত্যা এবং তারপর (১৯৪৭), মৃত্যুমল্লার (১৯৪৮), সুল সাগরের ভূতুরে দেশ (১৯৪৮), অজানা দ্বীপের রাণী (১৯৪৮), মোহনপুরের শ্মাশান (১৯৪৯), কুমারের বাঘা গোয়েন্দা (১৯৪৯), বিশালগড়ের দুঃশাসন (১৯৪৯), ছোট্ট পমির অভিযান (১৯৪৯), সুন্দরবনের মানুষবাঘ (১৯৫০), কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো (১৯৫১), আলো দিয়ে গেল যারা (১৯৫২), নবযুগের মহাদানব (১৯৫২), পাবন (১৯৫২), গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন (১৯৫২), তপোবন (১৯৫২), হিমাচলের স্বপ্ন (১৯৫২), সত্যিকার শার্লক হোম (১৯৫৩), বাঘবাজার অভিযান (১৯৫৪), দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান (১৯৫৬), চতুর্ভুজের স্বাক্ষর (১৯৫৬), ছত্রপতির ছোরা (১৯৫৭), নিশাচরী বিভীষিকা (১৯৫৭), এ্যালেকজেন্ডর দি গ্রেট (১৯৫৭), ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৮), সাজাহানের ময়ূর (১৯৫৮), বিভীষণের জাগরণ (১৯৫৯), জয়ন্তের অ্যাডভেঞ্চার (১৯৫৯), গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ (১৯৫৯), চল গল্পনিকেতনে (১৯৬০), রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার (১৯৬০), ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে (১৯৬১), হে ইতিহাস গল্প বলো (১৯৬১), কুবের পুরীর রহস্য (১৯৬১), ছোটদের ভালো ভালো গল্প (১৯৬১), রাত্রির যাত্রী (১৯৬১) প্রভৃতি।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি হল 'যকের ধন'। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যেও এটি একটি স্তম্ভস্বরূপ। একদিকে অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা, অন্যদিকে রহস্য গল্পের সাসপেন্স—সব মিলিয়ে 'যকের ধন' রচনাটি একসময় বাংলা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়াও 'জয়ন্তের কীর্তি', 'আবার যকের ধন', 'অজানা দ্বীপের রাণী', 'অদৃশ্য মানুষ', 'কিং কঙ', 'পঞ্চনদের তীরে', 'মুখ আর মুখোস', 'প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা' প্রভৃতি রচনাগুলি তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের অমূল্য সম্পদ। তাঁর রোমাঞ্চকর কাহিনিগুলির বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মানিক, সুন্দরবাবু, বিনয়বাবু, হেমন্ত, রামহরি প্রভৃতি চরিত্রগুলি ছোটদের খুব প্রিয়। গল্পগুলি পড়তে পড়তে ছোটরা যেন একাত্ম হয়ে যায় এঁদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের সাথে। তারাও যেন নেমে পড়ে রহস্যের জাল ছেঁড়ার কাজে। ছোটদের বড় করে তোলার, তাদের সমাজসচেতন করে তোলার একটা আন্তরিক প্রয়াস এখানে লক্ষ করা যায়। আসলে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ছোটদের একটা আলাদা আকর্ষণ ও আগ্রহ রয়েছে। লেখক চেয়েছেন ছোটদের সেই আগ্রহের বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে তাদের আরও বলিষ্ঠ দেহ ও মনের অধিকারী করে তুলতে। যে কোন কঠিন জটিল পরিস্থিতির সামনে তারা যেন সাহসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

হেমেন্দ্রকুমারের অনুবাদধর্মী রচনাগুলির জনপ্রিয়তাও অসাধারণ। তাঁর 'আজব দেশে অমলা' পাশ্চাত্য সাহিত্যিক Lewis Carroll-এর 'Alice in Wonderland'-এর একটি শ্রেষ্ঠ অনুবাদ। সহজ ভাষা ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গিতে রচিত এ গ্রন্থে রয়েছে লেখকের স্বকীয়তার ছোঁয়া। তাঁর রচনাশৈলীর গুণে বিদেশি মেয়ে 'অ্যালিস' কখন যেন আমাদেরই ঘরের মেয়ে 'অমলা' হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে 'কিং কঙ'-এর গল্পের স্বাদ একেবারেই আলাদা। কঙ নামে এক ভয়ঙ্কর গরিলা এই কাহিনির প্রধান চরিত্র, যাকে লেখক জাহাজবন্দী অবস্থায় আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে নিয়ে এসেছেন সোজা ভারতে। এই দীর্ঘ পথের নানান রোমাঞ্চকর ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে কলকাতায় পুলিশের গুলিতে কঙের অসহায় মৃত্যুতে।

এরই পাশাপাশি হেমেন্দ্রকুমার বেশ কিছু ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্বের বীরত্বের কাহিনিকেও সুন্দর ও সহজ ভঙ্গিতে ছোটদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের অতিপরিচিত চরিত্র চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে লেখা 'পঞ্চনদের তীরে', সমুদ্রগুপ্তকে নিয়ে লেখা 'ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে', তৈমুর লঙকে নিয়ে লেখা 'ভগবানের চাবুক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর অমর সৃষ্টি। এই পর্বে লেখা তাঁর 'আধুনিক রবিনহুড' গ্রন্থটির আবেদন একটু স্বতন্ত্র। বিখ্যাত দস্যু রবিনহুডের কথা আমরা সবাই জানি। তার ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। বড়লোকদের ধনসম্পদ লুঠ করে সে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। লেখক এই গ্রন্থে তেমনই এক মহৎপ্রাণ ডাকাত হুগো ব্রিট উইজারের অসাধারণ বুদ্ধি ও চাতুর্য ভরা এক একটি ডাকাতির কাহিনি শুনিয়েছেন। যে নিজেকে 'রবিনহুড' বলেই পরিচয় দিত। হুগো আসলে অস্ট্রিয়ার এক ভদ্র পরিবারের সন্তান। সে ছিল সুশিক্ষিত। বহুবিদ্যায় পারদর্শী। পুলিশ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে চোর-ডাকাত ধরত, সে সবই তার জানা ছিল। ফলে কেউ তাকে ধরতে পারত না। তার ডাকাতির কাহিনিগুলি যেমন মজার, তেমনই রোমাঞ্চকর। একবার এক প্রচণ্ড শীতের সন্ধ্যায় ভিয়েনার এক বড় কয়লা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চড়া দামে হুগো কিনে নেয়

প্রচুর কয়লা। তারপর একহাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিলিয়ে দেয় সেসব। সেদিন সেই প্রবল শীতের রাত্রে দরিদ্র মানুষগুলি একটু স্বস্তি পায়, আনন্দ পায়। এদিকে পরের দিন জানা গেল সেই ব্যবসায়ীর সিন্দুক থেকে সমস্ত টাকা চুরি গেছে। পরপর এমন দু'টি ঘটনায় সবাই যখন বিস্মিত এবং হতভম্ব, ঠিক তখনই 'রবিনহুড' নামে লেখা একটি খোলা চিঠিতে হুগো জানায়, "ঐ নীচ ব্যবসায়ী এই শীতে অকারণে কয়লার দাম বাড়িয়ে গরিবদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই তার এই শাস্তি।" [দেড়'শ ঘোড়ার কাণ্ড, পৃ: ২২৭] — এমনই বেশ কয়েকটি ভালো গল্প রয়েছে 'আধুনিক রবিনহুড' বইটিতে।

তবে গল্পের শেষে লেখক হুগোর সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, হুগোর ডাকাতির উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তার পথটি ছিল ভুল। ফলে তার পরিণাম হয়েছে ভয়ঙ্কর। গল্পের শেষাংশে তাই ছোটদের কাছে লেখকের আবেদন, "ভালো কাজ যদি করতে চাও, ভালো পথে থাকতে হবে।" [ঐ, পৃ. ২২৮] এই আবেদন সমস্ত ডাকাতির কাহিনির মধ্যেও একটা সদর্থক ভাব ও তাৎপর্য এনে দেয়। এইভাবেই ছোটদের মনে মহৎ আদর্শ, মানবতা ও সাহসিকতার পাশাপাশি সৎপথে চলার বার্তাও পৌঁছে দিয়েছেন লেখক।

'দেড়'শ খোকার কাণ্ড' হেমেন্দ্রকুমারের একটি অসাধারণ সাহিত্য-কীর্তি। ছোটরাই এই গল্পের প্রধান চরিত্র। প্রধান কুশীলব। সাধারণত 'ছোট' বলে যাদের অবহেলা বা উপেক্ষা করা হয়, তাদের মধ্যেও আছে বড়দের মতোই চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি, সাহস, আত্মসম্মানবোধ। আছে নিজের বীরত্ব প্রকাশের তীব্র আকুতিও। ছোটদের ভিতরের সেই 'বীরপুরুষ'-সত্তাটিকেই যেন লেখক এই গল্পে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। একদল দুরন্ত কিশোরের উপস্থিত বুদ্ধি ও তাৎক্ষণিক তৎপরতার সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে এখানে। গল্পটির মূল কাহিনি-অংশে দেখা যায়, গোবিন্দ সাধারণ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। বয়স বছর দশেক। পুজোর ছুটিতে ট্রেনে করে সে একাই চলেছে কলকাতায় মাসির বাড়ি। ট্রেনে ঘুমন্ত অবস্থায় এক 'ঘোড়ামুখো' দুষ্ট ব্যক্তি তার টাকা চুরি করে নেয়। ঘুম ভাঙার পর পকেট ফাঁকা দেখে গোবিন্দ তো হতভম্ব। এরপর সেই 'ঘোড়ামুখো' ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে গোবিন্দের সঙ্গে আলাপ হয় কলকাতার একদল খুদে ডিটেক্‌টিভের। যাদের বুদ্ধি, সাহস ও কর্মতৎপরতা অসাধারণ। ঘন্টু, প্রফেসর, মঙ্গল-সহ এমনই দেড়'শ খোকার সাহায্যে শেষপর্যন্ত গোবিন্দ ধরে ফেলে সেই ঘোড়ামুখো জোচ্চোর লোকটিকে। দেড়'শ খোকার এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যান পুলিশের বড়কর্তা, সাংবাদিক থেকে শুরু করে গোবিন্দের বাড়ির লোকজনও।

এমন গল্পের স্বাদ সহজে ভোলবার নয়। একাধারে রহস্য-রোমাঞ্চ, উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা আর আনন্দ-মজার বহু উপাদান রয়েছে এখানে। গোবিন্দ, ঘন্টু, প্রফেসরদের সাথে ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকারাও যেন কাহিনির বাঁকে বাঁকে অনুভব করে সেই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ। তার ওপর ঘন্টুর ওস্তাদি, প্রফেসরের ভারিক্কি চাল-চলন, খুদে মঙ্গলের কর্তব্যপরায়ণতা, গোবিন্দের মাসতুতো বোন নমিতার গিন্নিপনা — সব মিলে গল্পের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

হেমেন্দ্রকুমার গা-ছমছমে ভূতের গল্প -উপন্যাসও লিখেছেন অনেক। তাঁর জনপ্রিয় গোয়েন্দা গল্পগুলির

পাশাপাশি এই সমস্ত অতিপ্রাকৃত রচনার আবেদনও কিছু কম নয়। তাঁর 'সন্ধ্যার পরে সাবধান', 'ভূত আর অদ্ভুত', 'ছায়া-কায়া মায়াপুরে', 'আঁধার রাতের অতিথি', 'অদৃশ্য মানুষ', অমাবস্যার রাত', 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ', 'বিশালগড়ের দুঃশাসন', 'মোহনপুরের শ্মশান' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে ছোটরা শিহরিত হয়। মুগ্ধ হয় এমন বিশ্বস্ত ও আন্তরিক উপস্থাপনায়।

হেমেন্দ্রকুমার ভূত-প্রেত, রহস্য-অভিযান প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করলেও তাঁর অ্যাডভেঞ্চারমূলক রচনাগুলিই কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের সবচেয়ে প্রিয়। বড়রাও সাগ্রহে পড়ে থাকেন সেসব। রচনাগুলির কাহিনি-পরিকল্পনা ও ঘটনা-বিন্যাস অসাধারণ। সেখানে গল্পের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে গল্প। প্রতি পদে পদে থাকে বিপদের সম্ভাবনা। প্রতি পলে থাকে রোমাঞ্চ। আর কাহিনির শেষে থাকে বুদ্ধিদীপ্ত আকর্ষক পরিণাম। দেখা যায়, মানসিক শক্তি, অসমসাহস, আর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি শেষপর্যন্ত অতিক্রম করে সমস্ত বিপদ, বাধা, প্রতিকূলতা। পৌঁছে যায় তাদের লক্ষ্যে। 'যকের ধন', 'আবার যকের ধন' থেকে শুরু করে 'মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার', 'যশপতির রত্নপুরী', 'সূর্য নগরীর গুপ্তধন', 'ছোট পমির অভিযান' রচনাগুলির মূল আকর্ষণ এখানেই।

এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে 'অজানা দ্বীপের রাণী' গল্পটির কথা। নিছক অ্যাডভেঞ্চারের জন্যই 'সাত সমুদ্র তের নদীর পার' কলোম্বিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছে একদল তরুণ। যদিও ঘটনাচক্রে তারা পৌঁছে গেছে অজানা এক দ্বীপে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে ঘন জঙ্গলের আনাচে-কানাচে উঁকি দেয় হাজারো বিপদ। সে দ্বীপের অধিবাসী অসভ্য বুনোরাও ভারি ভয়ঙ্কর। এক বাঙালি তরুণী বিজয়া তাদের রাণী। জানা যায়, সমুদ্রে জাহাজডুবিতে বিজয়ার বাবা-মা মারা গেলেও সে বেঁচে যায়। আশ্রয় পায় সেই অজানা দ্বীপের বুনোদের মাঝে। এরপর কাহিনির পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়, দুঃসাহসী তরুণের দল বুদ্ধি আর শক্তির জোরে পরাস্ত করে বুনোদের। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা জয় করে বিজয়াকে নিয়ে তারা পাড়ি দেয় দেশের পথে।

হেমেন্দ্রকুমারের এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির সাহিত্যমূল্যও অনেক। একদিকে ছোটদের মনে আর্ন্তজাতিকতাবোধ জাগ্রত করা, দেশ-বিদেশের না ান দুঃসাহসিক অভিযানে তাদের সামিল করা, সর্বোপরি ছোটদের মধ্যে বলিষ্ঠ জীবনভাবনা সঞ্চার করায় রচনাগুলির ভূমিকা যথেষ্ট।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র-স্বরূপ। একাধারে তিনি শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি এবং দার্শনিক। মূলত 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) বইটির লেখকরূপেই তিনি বাংলার ছোট-বড় সকল পাঠকের মন জয় করে নিয়েছেন। বাংলার অকৃত্রিম পল্লীপ্রকৃতির বুকে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনাচরণের এমন অনুপুঙ্খ প্রাণবন্ত চিত্রায়ণ সত্যই বিস্ময়কব। 'পথের পাঁচালী' মূলগ্রন্থটির অংশবিশেষ অর্থাৎ সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পর্বটিকে লেখক নাম দিয়েছেন 'আম আঁটির ভেঁপু'। এই পর্বটি পৃথকভাবে সিগনেট প্রেস থেকে ১৯৪৪ সালে বইয়ের আকারে প্রকাশ পায়। সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থটির মধ্যে

এই পর্বটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। এখানে নিশ্চিন্দিপুরের শীতল স্নিগ্ধ প্রকৃতির মাঝে অপু-দুর্গার শৈশব কৈশোরের রঙিন স্বপ্নমাখা দিনগুলি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। একদিকে হরিহর-সর্বজয়ার দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে দৈনন্দিন সমস্যা-সংকট, অন্যদিকে অপু-দুর্গার চোখে রয়েছে কল্পনা আর স্বপ্নের সৌন্দর্যময় জগৎ। এই দুয়ের মিশ্রণে 'আম আঁটির ভেঁপু' অসাধারণ শিল্পগুণ লাভ করেছে। বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই অপু-দুর্গার মধ্যে খুঁজে পায় মুক্ত প্রাণের আনন্দ। আর অন্তহীন জীবনের ছন্দ।

বড়দের সাহিত্য রচনার পাশাপাশি বিভূতিভূষণ ছোটদের কথাও ভেবেছেন গভীরভাবে। লিখেছেন বেশ কিছু উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস। তাঁর এই সমস্ত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৮), 'মরণের ডঙ্কা বাজে' (১৯৪০), 'মিসমিদের কবচ' (১৯৪২), 'আম আঁটির ভেঁপু' (১৯৪৪), 'ছোটদের পথের পাঁচালী' (১৯৪৪), 'হীরা মাণিক জ্বলে' (১৯৪৬), 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৫৫) প্রভৃতি।

'চাঁদের পাহাড়' বিভূতিভূষণের কিশোর সাহিত্যসম্ভারের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ। পূর্ব-আফ্রিকার দুর্গম ভয়ঙ্কর অরণ্যপ্রকৃতির পটভূমিতে উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। বইটির শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন,

> "চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ.এইচ. জনস্টন, রোসিটা ফরব্‌স্ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।"[৪৩]

উপন্যাসটির মূল কাহিনিতে দেখা যায়, 'শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে'। দুরন্ত খেলোয়াড়, ভ্রমণপিয়াসী এই ছেলেটি কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয় সুদূর আফ্রিকায়। অবশ্য পৃথিবীর দূরদেশে দুঃসাহসিক অভিযানে যাবার গোপন ইচ্ছাও এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। সেখানে ইউগাণ্ডা রেলওয়ের নতুন লাইন তৈরির কাজে যোগ দিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় পূর্ব-আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। আফ্রিকার এই অরণ্য পরিবেশের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণ বলেছেন —

> "আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর! দেখতে বাবলা বনে ভর্তি বাঙলাদেশের মাঠের মতো দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল! যেখানে-সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা— পর মুহূর্তে কী ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।"[৪৪]

এমন ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিবেশে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ডিয়েগো আলভারেজের। ডিয়েগো অত্যন্ত দুঃসাহসী বীর পর্তুগীজ। তার কাছে রিখটারসভেল্ডের পর্বতমালায় হীরের খনির গল্প শোনে শঙ্কর। 'চাঁদের পাহাড়' নামে খ্যাত সেই পর্বতমালার দুর্গম পথে হীরের খনির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে তারা। পথে দুর্লঙ্ঘ্য বন-পর্বত অতিক্রম করে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এগিয়ে চলে অনির্দেশ্য হীরকখনি

আবিষ্কারের নেশায়। লেখক এই বইয়ে জনস্টন, ফরবস্ প্রমুখ ভ্রমণকারীদের গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে যেভাবে জীবন্ত ও বিশ্বস্ত রূপ দিয়েছেন তা অসাধারণ। ছোটরা আফ্রিকার গহন অরণ্যে, দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে ভয়ঙ্কর রোমহর্ষ নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিটি স্তরে অনুভব করে রোমাঞ্চকর আকর্ষণ। এখানে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা কিশোর সাহিত্যে এমন ক্লাসিক পর্যায়ের রচনা খুব কমই চোখে পড়ে।

এছাড়াও 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'হীরা মাণিক জ্বলে' প্রভৃতি রচনাতেও বিভূতিভূষণ ছোটদের উপহার দিয়েছেন অ্যাডভেঞ্চারের বিস্ময় আর আনন্দ। রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা। নির্ভেজাল গল্পরসের আস্বাদ। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শিশু-কিশোর সাহিত্যিক। খুব সচেতনভাবে সহজ ভাষায় ছোটদের সামনে তুলে ধরেছেন দেশ-বিদেশের চেনা-অচেনা জগতের বাস্তব ছবি। আর বর্ণময় বিচিত্র জীবনের প্রাণস্পর্শী কাহিনি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে জীবনের মহৎ আদর্শ। চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানবিকতা, সৎ-সাহস ও একাগ্র শ্রমের বিনিময়ে জীবন সংগ্রামে অজেয় হয়ে ওঠার বীজমন্ত্র।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯৬-১৯৭৮)

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে লিখে গেছেন একের পর এক ছোটদের উপযোগী গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ। সেকালের বিখ্যাত শিশুসাথী, মৌচাক, মাসপয়লা, রামধনু প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ পেত তাঁর এ সমস্ত রচনা। নিজের সম্পাদনায় খগেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা, পূজাবার্ষিকী। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল ছোটদের জন্য প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক কিশোর' (১৯৪৮)। শুধু বাংলায় বা ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম ছোটদের দৈনিকরূপে নয়, এশিয়ার প্রথম ছোটদের দৈনিক হিসেবে 'কিশোর' চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়াও ছোটদের মহল, পুষ্পপত্র, মানিকমেলা, সপ্তডিঙা প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার কাজে খগেন্দ্রনাথ সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন যথার্থ শিশু-সাহিত্যিক। ছোটদের কাছের মানুষ। গভীরভাবে তাদের কথা ভেবেছেন। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্ন-কল্পনার বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সারাজীবন মূলত ছোটদের সাহিত্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। লিখেছেন প্রায় শতাধিক গ্রন্থ। সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন। দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ফলে প্রচুর পরিমাণে লিখতে হয়েছে তাঁকে। সবক্ষেত্রে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মেই ছিল নিজস্বতার ছোঁয়া। ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ, মনীষীদের জীবনী, অভিযান কাহিনি, শিকার কাহিনি, ভ্রমণকাহিনি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিচিত্র রচনা, ডাকাতের গল্প, ভূতুড়ে গল্প, মজার গল্প প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদে আর রসে ভরা তাঁর সাহিত্যজগৎ। পাশাপাশি প্রাচীন দেশি-বিদেশি রূপকথা-পুরাণকথা-লোককথার ধারাকেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন সযত্নে। অন্যদিকে 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য' (১৯৫৮) নামক বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি অমূল্য গবেষণাগ্রন্থ রচনা

খগেন্দ্রনাথের এক অনবদ্য কীর্তি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হ'ল — ঝিলে জঙ্গলে (গল্প) - ১৯৩০, লামাদের দেশ তিব্বতে (ভ্রমণ) - ১৯৩২, সমুদ্রে ও ডাঙায় (গল্প) - ১৯৩২, আফ্রিকার জঙ্গলে (ভ্রমণ) - ১৯৩৩, আকাশ-পাতাল (গল্প) -১৯৩৪, সুন্দরবনের পথে (গল্প) - ১৯৩৪, ব্রেজিলের বন (গল্প) - ১৯৩৪, কারাকোরাম পর্বতে (গল্প) - ১৯৩৫, আশ্চর্য দেশ (গল্প) - ১৯৩৫, পাঁচশিকারী (গল্প) - ১৯৩৫, মুক্তাডুবুরী (গল্প) - ১৯৩৬, ছোটদের বেতালের গল্প (গল্প) - ১৯৩৭, সৈনিকের ডায়েরি (গল্প) -১৯৩৭, আগুনের পাহাড় (গল্প) - ১৯৩৭, জঙ্গলের জাল (গল্প) - ১৯৩৮, ডাকাতের ডুলি (গল্প) - ১৯৩৮, মমীর জীবন্ত হাত (গল্প) - ১৯৩৮, লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই (অনুবাদ) - ১৯৩৯, জেনে রেখো (সাধারণ জ্ঞান) - ১৯৩৯, দেশ বিদেশের হীরে জহরৎ (গল্প) - ১৯৪০, টলস্টয়ের ছোটদের গল্প (অনুবাদ) - ১৯৪০, আঙ্কল টমস্ কেবিন (অনুবাদ) - ১৯৪০, হাঞ্চ ব্যাক অফ নত্রদাম (অনুবাদ) - ১৯৪০, বেন হুর (অনুবাদ) - ১৯৪০, বাগদী ডাকাত (গল্প) - ১৯৪০, তাতারের বন্দী (গল্প) - ১৯৪১, আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী (বিজ্ঞান) - ১৯৪২, সীমান্ত পারে (ভ্রমণ) - ১৯৪২, তৈমুরলঙ্গের দেশে (ভ্রমণ) - ১৯৪৩, সিংহের থাবা (গল্প) - ১৯৪৪, মধুমতীর বাঁকে (গল্প) - ১৯৪৪, স্বপ্ন হলো সত্যি (গল্প) - ১৯৪৫, সত্য যা ঘটেছিল (গল্প) - ১৯৪৬, শয়তানের জাল (গল্প) - ১৯৪৬, বিজ্ঞান ও বীজানু (বিজ্ঞান) - ১৯৪৬, গোর্কির ছোটবেলার কথা (জীবনী) - ১৯৪৭, চীনের রূপকথা (রূপকথা) - ১৯৪৭, লালফৌজের কীর্তিকাহিনী (গল্প) - ১৯৪৭, রক্তমেঘ (গল্প) - ১৯৪৭, বন্দী কিশোর (গল্প) - ১৯৪৮, ছোটদের গল্প (গল্প) - ১৯৫১, বন রহস্য (গল্প) - ১৯৫১, ছোটদের রামায়ণ (গল্প) - ১৯৫৩, ছোটদের বিদেশী গল্প (গল্প) - ১৯৫৫, ভুতুরে গল্প (অনুবাদ) - ১৯৫৫, গল্প সঞ্চয়ন (গল্প) - ১৯৫৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র (জীবনী) - ১৯৫৬, অলিভার টুইস্ট (অনুবাদ) - ১৯৫৬, মেরু অভিযান (গল্প) - ১৯৫৬, যাঁদের লেখা তোমরা পড় (জীবনী) - ১৯৫৬, শেক্সপীয়রের নাটকের গল্প (অনুবাদ) - ১৯৫৬, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (গল্প) - ১৯৫৭, ব্ল্যাক অ্যারো (অনুবাদ) - ১৯৫৮, গহন বনের নিঝুমপুরী (গল্প) - ১৯৫৮, পাতালপুরীর কাহিনী (গল্প) - ১৯৫৯, ছোটদের মহাভারত (গল্প) - ১৯৬০, গল্প বলি গল্প শোনো (গল্প) - ১৯৬৯, বাংলার আলো (জীবনী) - ১৯৭৪, গল্প সংগ্রহ (গল্প) - ১৯৭৫, সুমন্ত (উপন্যাস) - ১৯৭৬, বনে জঙ্গলে (গল্প) - ১৯৭৭, বাংলার ডাকাত (গল্প) - ১৯৭৭, ভোম্বোল সর্দার (উপন্যাস) - ১ম খণ্ড-১৯৩৬; ২য় খণ্ড-১৯৫৫; ৩য় খণ্ড-১৯৭৫; ৪র্থ খণ্ড-১৯৭৮ প্রভৃতি।

যে কোনো বিষয়কেই ছোটদের মনের মতো করে পরিবেশন করার দক্ষতা ছিল খগেন্দ্রনাথের। তিনি ছোটদের মতো করে রামায়ণ, মহাভারত, দেশি-বিদেশি রূপকথা-গল্পগাথার সুন্দর রূপদান করেছেন। অনুবাদ করেছেন বেশ কিছু বিদেশি গল্প ও নাটকের। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Charles Dickens-এর 'Oliver Twist' অবলম্বনে লেখা 'অলিভার টুইস্ট', Mrs. Harret Beecher Stowe-এর 'Uncle Tom's Cabin' অবলম্বনে লেখা 'আঙ্কল টমস্ কেবিন', Victor Hugo-এর 'Hunchback of Notre Dame' অবলম্বনে লেখা 'হানচ্ব্যাক অফ নত্রদাম' প্রভৃতি। এছাড়াও 'টলস্টয়ের ছোটদের গল্প', 'শেক্সপীয়রের নাটকের গল্প', 'গোর্কির ছোটবেলার কথা' প্রভৃতি রচনাগুলি সহজ ও সরস আবেদনে বিশিষ্ট। লিখেছেন বেশ

কয়েকজন মনীষীর আদর্শ জীবনকথা। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিঃসন্দেহে মূল্যবান। ছোটদের যথার্থভাবে বড় হয়ে ওঠার পথে, মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই সমস্ত জীবনী পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে 'যাঁদের লেখা তোমরা পড়' বইটিতে অত্যন্ত সহজ, সরল ও অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিকদের একটা সাধারণ পরিচিতি তুলে ধরেছেন খগেন্দ্রনাথ। ছোটরা সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি সাহিত্যিকদেরও একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেয়ে যায় এই বইটি থেকে।

জীবিকার প্রয়োজনে খগেন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছে কিছু ফরমায়েসি লেখা। অনুবাদ, জীবনচরিতের পাশাপাশি লিখেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই। অতীত পৃথিবীর নানা তথ্য, পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক পরিচয়, প্রস্তরযুগ থেকে মানুষের বিবর্তনের বিচিত্র ইতিহাস তুলে ধরেছেন 'অতীতের পৃথিবী' বইটিতে। বিজ্ঞানের জটিল আবিষ্কারের সরল বর্ণনা মেলে 'আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী'-তে। এছাড়াও 'জেনে রেখো', 'বিজ্ঞান ও বীজাণু', 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন' প্রভৃতি বইগুলিতে ছোটদের মনের মতো করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা করেছেন খগেন্দ্রনাথ। আসলে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র নন, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানবোধ ছিল সুস্পষ্ট। আর তার সঙ্গে ছিল সাহিত্যিকের সরস বাক্‌ভঙ্গি। অন্যদিকে তাঁর অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ ভ্রমণমূলক রচনাগুলিও অসাধারণ। 'লামাদের দেশ তিব্বতে', আফ্রিকার জঙ্গলে', 'ব্রেজিলের বন', 'কারাকোরাম পর্বতে', 'সীমান্ত পারে', 'তৈমুরলঙ্গের দেশে' ছড়িয়ে রয়েছে তার সার্থক নিদর্শন। আবার 'সুন্দরবনের পথে', 'সমুদ্রে ও ডাঙায়', 'আগুনের পাহাড়', 'আশ্চর্য দেশ', 'সৈনিকের ডায়েরি', 'মেরু অভিযান' প্রভৃতি রচনাগুলি পড়তে পড়তে ছোটরা পৌঁছে যায় দেশ-বিদেশের রোমাঞ্চকর সব স্থানে।

গল্প বলার একটা অনবদ্য আন্তরিক ভঙ্গি ছিল খগেন্দ্রনাথের। তা সে বন-জঙ্গল, শিকার-অভিযানের গল্প হোক, বা ভূত-প্রেত, ডাকাত-দস্যুর রোমহর্ষক কাহিনি হোক — ছোটদের ভালোলাগার, ভালোবাসার বিষয়গুলিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সবসময়। তবে অলীক-অবান্তর কোন কাহিনির স্থান নেই সেখানে। তাই তাঁর অধিকাংশ ভূতের গল্প এক অতিপ্রাকৃত ভয়ার্তপরিবেশে সৃষ্টি হলেও শেষপর্যন্ত ভূতের ভয় ভেঙে গেছে। সমস্ত ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ শেষে মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আবার প্রাচীন লোক-ইতিহাস ও প্রচলিত কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে খগেন্দ্রনাথ লিখেছেন বেশ কিছু আকর্ষণীয় ডাকাতের গল্প। 'ডাকাতের ডুলি', 'মনোহর ডাকাত', 'বাগদী ডাকাত', 'বিশে ডাকাত', 'তাতারের বন্দী', 'কালো পাঞ্জা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে রয়েছে ইতিহাসের সত্যতা। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙলার ডাকাত' বইটির কথা। উভয়ক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর ডাকাত চরিত্রের মানবিক দিকগুলি চোখে পড়ার মতো। ছোটদের আসরে খগেন্দ্রনাথের ভূমিকা একজন নির্ভেজাল গল্পকথকের। নীতিশিক্ষা, উপদেশ বা জ্ঞান দিয়ে তিনি ছোটদের বিরাগভাজন হননি, কিন্তু তাঁর গল্পগুলি পড়তে পড়তে ছোটরা সহজেই চিনে যায় আশপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ, জগৎটাকে। শিখে যায় অসহায় দরিদ্র মানুষগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহমর্মী হ'তে। 'ঝিলে জঙ্গলে', 'পাঁচশিকারী', 'ছোটদের গল্প', 'গল্প সঞ্চয়ন', 'গল্প বলি গল্প শোনো', 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'গল্প সংগ্রহ' বইগুলিতে রয়েছে সেই সাফল্যের নিদর্শন।

অবশ্য বাংলার কিশোরমহলে খগেন্দ্রনাথের বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ 'ভোম্বোল সর্দার' বইটি। বাংলা ভাষায় লেখা কিশোর উপন্যাসগুলির মধ্যে এর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। প্রচুর জনপ্রিয়তার জন্যই উপন্যাসটি পরবর্তীকালে হিন্দি, রুশ ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। এখানে পিতৃমাতৃহীন এক দুরন্ত কিশোর ভোম্বোলের বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। চিরকালের কিশোরমনের অদম্য মুক্তির আকাঙ্ক্ষা খুব সহজ ও সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। খগেন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন 'শিশুসাথী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'ভোম্বোল সর্দার' প্রকাশের পরেই। সেদিক থেকে রচনাটিকে খগেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তিস্তম্ভ বলা চলে। চারখণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায় ১৯৩৬ সালে। পরবর্তী তিনটি খণ্ড প্রকাশ পায় যথাক্রমে ১৯৫৫, ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালে। আমরা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ছোটদের সাহিত্যধারায় সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি খগেন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য বেশ কয়েকটি নাটকও লিখেছেন। জন্মদিন, ঘুগনিদানা, শোনপাপড়িওয়ালা প্রভৃতি নাটিকাগুলি যেমন মজার তেমন শিক্ষার। নিছক বিনোদন নয়, সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে এখানে। যেমন 'জন্মদিন' নাটকে চির-নতুন শিশুর গলায় শোনা যায় সেই বাস্তব জগতেরই উচ্ছল আনন্দধ্বনি —

"আমরা শিশু, আমরা আশা, আমরা নূতন প্রাণ
আমরা হাসি, আমরা আলো, আমরা নূতন গান।
ওই যে কুমোর, ওই যে চাষী, ওই যে রাখাল বাজায় বাঁশী;
সবার ঘরে আমরা আছি সকলেই সমান।
আমরা শিশু, আমরা হাসি, আমরা নূতন প্রাণ
সকলকে আজ শুনিয়ে দেব এই আনন্দ-গান।" [পৃ: ৫৫]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

কাজী নজরুল ইসলাম এই নামটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। অবশ্য নজরুলের পরিচয় অনেকটাই সীমায়িত থেকে গেছে 'বিদ্রোহী কবি'রূপে। আসলে নজরুলের সাহিত্যিক প্রতিভা বহুধাবিস্তৃত। শুধু বিদ্রোহ নয়, প্রেম-প্রীতি স্নেহ-বাৎসল্য ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সৃষ্টিজগতে। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও তিনি গভীরভাবে ভেবেছেন এবং লিখেছেন। তাঁর ছোটদের সাহিত্যসম্ভার তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেশ কিছু উৎকৃষ্ট ছড়া-কবিতা-গল্প-নাটক নিয়ে তিনি হাজির হয়েছেন ছোটদের আসরে। সে সমস্ত রচনার বিষয়বৈচিত্র্যও অসাধারণ। কখনো প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য, কখনো সমাজের কঠিন বাস্তবতা, আবার কখনো নিছক হাসি, মজা আর আনন্দের উপাদানে সাজিয়ে দিয়েছেন ছোটদের সাহিত্যভাণ্ডার। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হ'ল— ঝিঙে ফুল (১৯২৬), সাত ভাই চম্পা (১৯২৭), পুতুলের বিয়ে (১৯৩৩) প্রভৃতি।

নজরুলের সাহিত্যভুবন আপন স্বাতন্ত্র্যে ও পাণ্ডিত্যে চির উজ্জ্বল, চির দীপ্যমান। ছোটদের জন্য রচনাগুলিতেও সেই বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। প্রচলিত কোনো রচনারীতির অনুসরণ করেননি তিনি। বরং

খুব সচেতনভাবে ছোটদের মনোজগৎকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। উপলব্ধি করেছেন তাদের ভালোলাগা মন্দলাগার দিকগুলি। ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনও অলীক আজগুবি বিষয়ের সাহায্য নেন নি। উপযুক্ত শব্দ-ছন্দ, ভাষা ও ভাব দিয়ে মজা সৃষ্টির একটা নিজস্ব ধারা ছিল তাঁর। 'ঝিঙে ফুল', 'সাত ভাই চম্পা' বইয়ে নজরুল ছোটদের জন্য মজার মজার বেশ কিছু ছড়া-কবিতা রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ'ল 'লিচুচোর', 'খাঁদু-দাদু', 'ঝিঙে ফুল', 'খুকী ও কাঠবেড়ালি', 'প্রভাতী' প্রভৃতি কবিতাগুলি। অবশ্য 'ভোর হোলো/দোর খোলো' খ্যাত 'প্রভাতী' কবিতাটির একটা অন্যরকম আবেদন আছে। ছোটরা কবিতাটি পড়তে পড়তে তার সুমধুর ছন্দ-দোলায় দুলে ওঠে। উপভোগ করে ভোরবেলার প্রতিটি বর্ণময় মুহূর্ত।

অন্যদিকে 'লিচুচোর' কবিতায় কবি চিরন্তন শিশুমনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা দুষ্টু দুরন্ত বালকটির সন্ধান পেয়েছেন। যে লিচু চুরি করতে গিয়ে পদে পদে নানান বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। শেষপর্যন্ত চুরি করতে যাওয়ার ফলটিও 'ধুমাধুম গোটা দুচ্চার/..... কিল ও ঘুসি' সে হাতে-নাতে পেয়ে গেছে। ছোটরা এমন একটি নিটোল গল্প-কবিতা পড়ে ফেলে হাসতে হাসতে। যদিও চুরি করার করুণ পরিণতি চাক্ষুষ দেখার পর ছোটরা বুঝি কিছুটা সাবধানী হয়ে পড়ে। দুরন্ত বালকটির সাথে তারাও যেন ভবিষ্যতে এমন অপকর্ম আর না করার শপথ নিয়ে নেয় —

"যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
.....
কি বলিস্? ফের হপ্তা?
তৌবা— নাক খপ্‌তা!"

[ঝিঙে ফুল, নজরুল-রচনাবলী (৫ম খণ্ড), পৃ: ৯০]

'খুকী ও কাঠবেড়ালি' কবিতাতে মেলে গল্পরসের সুমিষ্ট স্বাদ। এখানে খুকী এবং কাঠবেড়ালির পারস্পরিক টক-মিষ্টি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছোটদের কল্পনাপ্রবণ মনটি ধরা দিয়েছে। কবিতাটি সুখপাঠ্য এবং বিশেষ উপভোগ্য।

নজরুল ছিলেন একজন সমাজসচেতন বাস্তববাদী সাহিত্যিক। কোন অসম্ভব উদ্ভট কল্পনার আশ্রয়ে লঘু হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তাই বাস্তবের সম্ভাব্য উপাদান দিয়েই তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটা স্বতন্ত্র ছোটদের জগৎ। চারপাশের জটিল যান্ত্রিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরেরা সে জগতে অনুভব করে স্বাধীন সজীব প্রাণের স্পর্শ। সম্ভাব্যতার নির্মল মজা। অবশ্য ছোটদের চরিত্রগঠনেও নজরুল ছিলেন সজাগ অভিভাবক। স্বদেশপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবতাবোধ প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়কে তিনি সহজভাবে ছোটদের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। 'পুতুলের বিয়ে' এমনই একটি উৎকৃষ্ট নাটক। যেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের জয়গান গেয়েছেন নজরুল। 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' — এই গানটির মধ্য দিয়ে ছোটদের মনে সম্প্রীতি ও একতার বোধ জাগাতে চেয়েছেন।

আজকের সঙ্কটময় যুগবাস্তবতার নিরিখে এমন রচনার সাহিত্যমূল্য ও বাস্তব গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

সমকালীন বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত যুগবাস্তবতার পটভূমিতে নজরুল বাংলার কিশোরসমাজকে সজাগ করে তোলার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'কিশোর' [কবিতা সংকলন ঃ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ] কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বেশ কিছু কবিতায় কবির সেই সমাজসচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় মেলে। 'সংকল্প', 'কিশোরের স্বপ্ন', 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে তারই সুন্দর নিদর্শন। তাঁর 'সংকল্প' কবিতায় কবি দুরন্ত কৌতূহলী কিশোরের মতোই বিশ্বের সমস্ত রহস্য উন্মোচনে আগ্রহী হয়েছেন। তাই কবির দৃঢ় সংকল্প—

"থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌বো এবার জগৎটাকে,—
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে
ছুট্‌ছে তা'রা কেমন ক'রে,
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তা'রা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।।" [কিশোর, ঐ, পৃ: ১৩৩]

'কিশোরের স্বপ্ন' কবিতাতেও নজরুল ছোটদের জবানিতে সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার সংকল্প নিয়েছেন —

"মা! আমারে সাজিয়ে দে গো বাইরে যাওয়ার বেশে,
রইব না আর আঁচল-ঢাকা গণ্ডী-আঁকা দেশে।" [ঐ, পৃ: ১৩৭]

এভাবেই নজরুল অত্যন্ত আন্তরিক ভঙ্গিতে, ছোটদের মতোই সতেজ, সবুজ প্রাণবন্ত মন থেকে সবকিছু লিখেছেন। তাই সেখানে রয়েছে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, দুর্লভ মানবতাবোধ আর সমাজ ও স্বদেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। একাধারে রয়েছে রস-রসিকতা এবং অব্যক্ত নীতিকথা। ছোটদের কাছে যা চিরন্তন উপভোগ্য ও শিক্ষণীয়।

সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭)

বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একজন অন্যতম সেরা সাহিত্যিক **সুনির্মল বসু**। একান্তভাবে ছোটদের কথা ভেবে শুধু তাদের জন্যই আজীবন সাহিত্যচর্চা করে গেছেন তিনি। আত্মভোলা স্বভাবরসিক এই মানুষটির কাছে সাহিত্যসৃষ্টি ছিল গভীর সাধনার বস্তু। তাই তাঁর রচনায় মেলে পরিশুদ্ধ নির্মল জীবনের স্বাদ। মুক্ত প্রাণের ছন্দ। আর অনন্ত খুশির ভাণ্ডার। যা দীর্ঘকাল ধরে ছোট-বড় সকল পাঠককেই সমানভাবে আকর্ষণ করে চলেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাওয়ার দোলা' প্রকাশ পায় ১৯২৫ সালে। তখন থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে সুনির্মল রচনা করেছেন শতাধিক ছোটদের উপযোগী গ্রন্থ। লিখেছেন ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, পুরাণকথা, রূপকথা, জীবনী, স্মৃতিকথা, আরো কত কী। বিষয় বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর সৃষ্টিসম্ভার। কোথাও প্রকৃতির সবুজ সৌন্দর্য, কোথাও বাস্তব সমাজচেতনা, কোথাও রূপকথার রহস্য, অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ, আবার কোথাও হাসি, মজা, আর কৌতুকের হাল্‌কা আমেজ।

সুনির্মল ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সৎ ও সচেতন সাহিত্যস্রষ্টা। মূলত ছোটদের সাহিত্যের লেখকরূপে তিনি খ্যাত হলেও তাঁর সৃষ্টি ছোট-বড় সবার কাছেই সমান প্রিয়। সমান আদরণীয়। তাঁর প্রথম পরিচয় কবি-ছড়াকার সুনির্মলরূপে। যদিও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে ছিল তাঁর অনায়াস যাতায়াত। লিখেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রচুর গল্প-কাহিনি। পাশাপাশি উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধও লিখেছেন সমান তালে। সেকালের প্রায় সমস্ত শিশুপাঠ্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর এ সমস্ত রচনা প্রকাশ পেত। সন্দেশ, রামধনু, শিশুসাথী, মৌচাক, পাঠশালা, রংমশাল, মুকুল, শিশুভারতী, কৈশোরক প্রভৃতি পত্রিকার নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'আনন্দমেলা' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগেও সুনির্মল লিখেছেন নিয়মিত। নিজের সম্পাদনাতেও প্রকাশ করেছেন বেশ কিছু পত্রিকা। তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশ পায় প্রথম কিশোর পাক্ষিক 'কিশোর এশিয়া' (১৯৪৬)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল— আরতি, ঝলমল, বরণডালা, ছোটদের চয়নিকা প্রভৃতি। পাশাপাশি পাতার ভেঁপু (১৯২৫), পাততাড়ি (১৯৩২), আলপনা (১৯৩৯), ঝিলমিল (১৯৪৩), জানোয়ার (১৯৫৭), মশগুল (১৯৫৭), সরগরম (১৯৫৮) প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের কাজেও সরাসরি যুক্ত ছিলেন তিনি।

আমরা আগেই বলেছি সুনির্মল তাঁর বত্রিশ বছরের সাহিত্য জীবনে লিখেছেন শতাধিক গ্রন্থ। সে সমস্ত রচনাগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, সাহিত্য-সংকলনে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। দেখা যাচ্ছে, তাঁর বেশ কিছু রচনা আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। আমরা সাধারণভাবে তাঁর বৃহৎ সাহিত্যকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উল্লেখ করছি।

ছড়া ও কবিতা ঃ হাওয়ার দোলা (১৯২৫), হুলুস্থুল (১৯২৮), তোলপাড় (১৯২৯), কবিতা মঞ্জরী (১৯২৯), টুনটুনির গান (১৯৩০), হট্টগোল (১৯৩২), হাসিকান্নার দেশে (১৯৩৪), জানোয়ারের ছড়া (১৯৪৮), কিশোর আবৃত্তি (১৯৫০), ছড়ার ছবি (১-৪ ভাগ, ১৯৫০-৫৩), রঙিন হাসি (১৯৫১), আমার ছড়া (১৯৫২), ছড়া ছবিতে জানোয়ার (১৯৫২), মনের মতো বই (১৯৫৫), হুল্লোড় (১৯৫৭), কবিতা চয়ন (?), কেবল হাসির দেশে (?), শ্রেষ্ঠ কবিতা (?)।

গল্প ঃ সব ভূতুরে (১৯৩৩), হাসি মুখ (১৯৩৩), কানাকড়ির খাতা (১৯৩৪), দিল্লি কা লাড্ডু (১৯৩৪), মিহিদানা (১৯৩৪), হাসিকান্না (১৯৩৪), মরণ ফাঁদ (১৯৩৫), মরণের মুখে (১৯৩৫), জীবন্ত কঙ্কাল (১৯৩৬), মরণের ডাক (১৯৩৬), লালন ফকিরের ভিটে (১৯৩৬), অসম্ভব দুনিয়ায় (১৯৩৭), গুজবের জন্ম (১৯৩৯), নিঝুমপুরের স্বপ্নকথা (১৯৩৯), রাঙামামার ভাঙা আসর (১৯৩৯), আদিম দ্বীপে (১৯৪০), কেউটের ছোবল (১৯৪২), ইন্টি বিন্টির আসর (১৯৫০), সোজা বই (১৯৫০), ছোটদের পদ্মপুরাণ (১৯৫২), শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ (১৯৭৫), শহুরে মামা ও কানাকড়ি (১৯৮৩), রোমাঞ্চের দেশে (১৯৮৩), রোমাঞ্চকর অঞ্চলে (?), অল্প কথায় রামায়ণ (?), ছোটদের নীতিকথা (?), হারু সর্দারের বাঘ শিকার (?)।

উপন্যাস ঃ কিশোর উপন্যাস (১৯৭৫)।

নাটক ঃ কিপটে ঠাকুরদা (১৯৩৩), বীর শিকারী (১৯৩৩), তেপান্তরের মাঠে (১৯৫৫), শিশুনাট্য (১৯৫৫), আনন্দনাড়ু (১৯৫৭), শহুরে মামা (১৯৫৭), বন্দি বীর (১৯৬০)।

রূপকথা ঃ রঙিন দেশের রূপকথা (১৯৪০)।

জীবনী ঃ বিদ্যাসাগর (১৯৫৫), ঠাকুর রামকৃষ্ণ (১৯৫৬), মাইকেল মধুসূদন (১৯৫৬), বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৫৮), মহামানবের জীবনকথা (১৯৭৫), ছোটদের বিদ্যাসাগর (১৯৮০), রাজা রামমোহন (?), শহীদ স্মরণে (?)।

স্মৃতিকথা ঃ জীবন খাতার কয়েক পাতা (১৯৫৫)।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ছড়া ছবিতে অ আ ক খ (১৯৫৬)।

ছন্দ শিক্ষা ঃ ছন্দের টুং টাং (১৯২৯), ছন্দ ঝুমঝুমি (১৯৩২), ছোটদের কবিতা শেখা (১৯৫১), ছন্দের গোপন কথা (১৯৫৬)।

সুনির্মলের গল্পগুলির বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। সেখানে রূপকথার চিরন্তন অপরূপ জগৎ যেমন প্রাণবন্ত, তেমনি ভূত-প্রেত, রহস্য-রোমাঞ্চের আবহও ভীতিপ্রদ অথচ আকর্ষণীয়। বিচিত্র রূপকথার গল্পকাহিনি নিয়ে সুনির্মল রচনা করেন 'রঙিন দেশের রূপকথা'। রূপকথার সরস কথকতার ভঙ্গিটি ছিল তাঁর করায়ত্ত। তাই রূপকথার প্রচলিত প্রথা অনুসারে গল্পের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছড়া-কবিতার সংযোগ ঘটিয়ে তিনি রচনাগুলিকে আরো প্রাঞ্জল ও মনোহারী করে তুলেছেন। বীর রাজপুত্রের রাজকন্যা উদ্ধারের কাহিনি — রূপকথার এই চিরপরিচিত সুরটিই ধরা পড়েছে সুনির্মলের অধিকাংশ রূপকথাধর্মী রচনায়। 'রাজপুত্র ও উজিরপুত্র', 'রাজার মেয়ে চম্পাবতী' গল্পগুলি এর সুন্দর নিদর্শন। এছাড়াও 'উদ্ধবের বরাত', 'হিংসুটে রাণীর কীর্তি', 'বাঁদর রাজপুত্র' গল্পগুলির আবেদন চিরন্তন।

ভূত-প্রেত, রহস্য-রোমাঞ্চকর গল্পকাহিনি রচনাতেও সুনির্মল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি অলৌকিক-অপ্রাকৃত পরিবেশে গা ছমছমে ভূতের গল্প লিখেছেন অনেক। অবশ্য অনেক গল্পে রোমহর্ষ ভৌতিক বাতাবরণে কাহিনির সূচনা হলেও সমস্ত অলৌকিকতার রহস্য উন্মোচনে তার সমাপ্তি ঘটেছে। তবে এ ধরনের ভয় ভাঙানো ভূতের গল্পের সংখ্যা খুবই কম। তাঁর 'সব ভূতুরে', 'জীবন্ত কঙ্কাল', 'মরণের ডাক' প্রভৃতি গল্পগুলি ছোটদের মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়। ভয়-ভীতি, রহস্য-রোমাঞ্চের বিচিত্র স্বাদ রয়েছে এখানে। 'সাদা ভূত', 'ভীষণ কাণ্ড', 'ভূতের বাড়ি', 'মানুষ নয়', 'রামেন্দু ডাক্তার' গল্পগুলি বেশ উপভোগ্য। এ সমস্ত গল্পে রয়েছে অবিশ্বাস্য অদ্ভুতুড়ে নানান কাণ্ডকারখানা। মানুষের বেশ ধরে এসে ভূতেরা যে কী ভীষণ কাণ্ড ঘটাতে পারে তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত 'রামেন্দু ডাক্তার' গল্পটি। এটি 'লালন ফকিরের ভিটে' গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।

এ গল্পে দেখা যায়, রামেন্দু ডাক্তার তাঁর জমজমাট ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করে ডাক্তারি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন ভয়ঙ্কর ভূতের উপদ্রবের কারণে। জানা যায়, একদিন রাত্রে রামেন্দু তাঁর ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করতে যাবেন এমন সময় আবদুল নামে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে রোগী দেখতে যাবার অনুরোধ জানায়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি রাজি হয়ে যান। কিন্তু এরপরেই ঘটে যায় যা কিছু বিপত্তি। আবদুলের সঙ্গে দীর্ঘ দুর্গম পথ পেরিয়ে এসে ডাক্তার যখন পৌঁছলেন রোগীর ঘরে, তখন আবদুল হঠাৎ বেপাত্তা। ওদিকে ডাক্তার দেখেন রোগীর শয্যায় শুয়ে আছে আবদুল স্বয়ং। তার কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠেন ডাক্তার, অনুভব করেন 'জীবন্ত মানুষের শরীর এত ঠাণ্ডা হতে পারে না'। সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসার সময় ডাক্তার শুনতে পান সেই প্রেতপুরী থেকে আবদুল বলছে, 'আচ্ছা আজ পালালেন, কাল রাত্রে আবার আপনার খোঁজ করব — রোগীর ব্যামো আপনাকে সারাতেই হবে —' [সুনির্বাচিত সুনির্মল, পৃ: ১৪৮]। এমন নিটোল ভূতের গল্প সুনির্মল রচনা করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। যেমন সরস ও সহজ ভাষাভঙ্গি, তেমনি বিষয় ও ভাবের উপযোগী তার উপস্থাপন। আবার ভয় ভাঙানো ভূতের গল্পের মধ্যে 'মন্টুমামার গল্প', 'ভূতের ভয়' প্রভৃতি গল্পগুলিও আকর্ষণীয়। এখানে প্রথম দিকে পরিবেশ-প্রতিবেশের বর্ণনায় ভৌতিক পরিমণ্ডল তৈরি করা হলেও শেষপর্যন্ত ভূতের ভয় ভেঙে গেছে। শুধু ছোটরা নয়, যে কোন বয়সের পাঠক এই ধরনের গল্পরস উপভোগ করেন।

ভূতের গল্পের পাশাপাশি রহস্য-রোমাঞ্চভরা শিকারকাহিনি ও অভিযানকাহিনিও লিখেছেন সুনির্মল। তাঁর রোমাঞ্চকর অভিযানকাহিনিগুলি বাংলা কিশোর সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'মরণ ফাঁদ', 'জীবন্ত কঙ্কাল', 'মরণের অভিমুখে', 'কেউটের ছোবল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ণনাভঙ্গির ঋজুতায় ও গতিময়তায় গল্পগুলি সুপাঠ্য হয়ে উঠেছে। 'জীবন্ত কঙ্কাল' গল্পে দেখা যায়, প্রণব, প্রশান্ত, প্রভাত, প্রফুল্ল — চার বন্ধু অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় শরতের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। লেখক জানিয়েছেন, 'ভ্রমণের নেশা তাদের মরণের ভয়কেও জয় করেছিল।' এই অভিযাত্রীদল কীভাবে 'পিল-পিল্লা' নামের এক জীবন্ত কঙ্কালের সাক্ষাৎ পায়, তারই রোমহর্ষক কাহিনি এই রচনাটি।

তবে সুনির্মলের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা হাল্‌কা হাসি মজার গল্প রচনায়। ছোটরা হাসির গল্প, মজার গল্প পড়তে খুব ভালোবাসে। স্বাভাবিকভাবেই ছোটদের সাহিত্যে এই জাতীয় রচনার আধিক্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু শুধু হাসি-মজার কথা বলে ছোটদের বিনোদন করা সাহিত্যিকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; তাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্বও রয়েছে সাহিত্যিকদের ওপর। সুনির্মল একথা উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে। তাই তাঁর সরস কৌতুক গল্পগুলিও একাধারে মনোগ্রাহী ও শিক্ষণীয়। হাসি মজার আড়ালে সেখানে সংগুপ্ত রয়েছে সূক্ষ্ম সমাজভাবনা ও জীবনবোধ। তাঁর 'নকুলবাবু নাকাল', 'মানিকজোড়', 'পাগল রহস্য', 'সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত', 'কীর্তিপদের কীর্তি', 'গুজবের জন্ম' প্রভৃতি গল্পগুলি এই পর্যায়ের সার্থক সৃষ্টি।

'মানিকজোড়' গল্পে স্কুল-পড়ুয়া একদল দুরন্ত কিশোরের প্রাত্যহিক নানা মজাদার কীর্তিকলাপের কাহিনি বর্ণনা করেছেন সুনির্মল। গ্রাম থেকে আসা দুই সহজ সাধারণ কিশোর কমলাকান্ত ও গঙ্গারামকে এই শহুরে ছেলেরা নাম দিয়েছে 'মানিকজোড়'। কারণে-অকারণে তারা কমলাকান্ত ও গঙ্গারামকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে বারবার। অবশ্য শেষপর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হ'লে দেখা যায়, শহরের ছেলেরা পড়ালেখার ক্ষেত্রে হার মেনেছে গ্রামের দুই কিশোর 'মানিকজোড়'-এর কাছে। এভাবে অসাধারণ কৌশলে লেখক গ্রাম ও শহরের ছেলেদের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিবাদের মীমাংসা ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে 'সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত'

গল্পটিও স্কুলবয়-স্টোরির একটি অনন্য উদাহরণ। সত্যব্রতের স্বচ্ছন্দ মিথ্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে তা দমফাটা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। দেখা যায়, সে অবলীলায় বলে গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জ্যাঠামশাই, সরোজিনী নাইডু তার পিসি, বর্ধমানের মহারাজা তার বাবার 'ফ্রেন্ড', পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর তার কাকার শাগরেদ, গান্ধিজি তার মেশোমশাই—এমনই আরো ভুরি ভুরি মিথ্যা কথা। এ ধরনের হাসি-মজার উপাদান ছোটদের সাহিত্যে অনেক। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'চালিয়াৎ চন্দর', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা' প্রভৃতি চরিত্রের সাবলীল মিথ্যাচারের কাহিনি সবার জানা। সুনির্মলের 'সত্যব্রতের মিথ্যাব্রত' গল্পটি নিঃসন্দেহে এই পর্বের একটি সেরা সৃষ্টি।

আবার অনেক গভীর জটিল সমাজসমস্যার কথাও সুনির্মল ব্যক্ত করেছেন সরস হাস্যকর বাতাবরণে। তাঁর 'গুজবের জন্ম', 'কীর্তিপদের কীর্তি' গল্পগুলির কথা প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে। 'গুজবের জন্ম' গল্পের মধ্য দিয়ে গুজবের ভয়াবহ পরিণতির কথা লেখক প্রকাশ করেছেন অপূর্ব হাস্য-বিষাদময় পরিমণ্ডলে। গল্পের প্রথমাংশে দেখা যায়— 'বাবু তামাক খেয়ে আফিসে যাবেন, তাই কেষ্টা তাড়াতাড়ি করে যেই হুঁকোটা বাবুকে এগিয়ে দিতে যাবে অমনি কলকে থেকে এক টুকরো টিকের আগুন হঠাৎ বৈঠকখানার দামি ফরাসটার উপরে পড়ে গিয়ে খানিকটা জায়গা পুড়ে গেল'। —এই সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে উঠেছে লোকের মুখে মুখে। রটে যায়, কেষ্টা নাকি ডাকাতের দলে যোগ দিয়ে বাবুর জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি, এমনকি বাবুকে পর্যন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। তারকবাবু অফিস ফেরার পথে এ গুজব শুনে বিস্ময়ে হতবাক। এখানেই শেষ নয়। বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন, কেষ্টাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। 'তবে ডাকাতের দলের অন্য কেউ এখনও ধরা পড়েনি। জোর তদন্ত চলছে।' গল্পটি আগাগোড়া হাসির এবং মজার। তবে এই হাসি-মজাকে ছাপিয়ে গল্পের শেষাংশে প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক জীবনে গুজবের পরিণামের করুণ-সত্য দিকটি।

অন্যদিকে 'কীর্তিপদের কীর্তি' গল্পেও রয়েছে আপাত হাস্য-পরিহাসের অন্তরালে সমাজবাস্তবতার একটি পরিচিত ঘটনা। 'অনিচ্ছাকৃত ভুল' খবর 'ইচ্ছাকৃত' প্রকাশের ফলে একটি সংবাদপত্র কীভাবে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে — তারই সুন্দর দৃষ্টান্ত সুনির্মল এ গল্পে তুলে ধরেছেন। আসলে সুনির্মল ছিলেন প্রকৃতই রসিক স্বভাবের মানুষ। অবশ্য তাঁর সমাজসচেতনতাও ছিল অসাধারণ। তাই সমাজের নানা অসঙ্গতিপূর্ণ দিকগুলিকে ছোটদের কাছে সরসভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি।

'কুট্টিমামার আবিষ্কার' গল্পটিও একটি অসাধারণ হাসির গল্প। কল্পবিজ্ঞানের একটু আভাস মেলে এ গল্পে। দেখা যায়, একটা বড় কিছু আবিষ্কার করে দেশের-দশের কাজে লাগাটাই কুট্টিমামার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন 'দাঁড়মোনিয়াম' নামের এক অদ্ভুত যন্ত্র। এই যন্ত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন, "সাতটি দাঁড়কাককে পাশাপাশি খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। স্প্রিংয়ের ক্লিপ দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ। সেই স্প্রিংয়ের সঙ্গে সরু সরু সাতটি শিকল লাগানো হয়েছে। শিকল ধরে আস্তে আস্তে টানলেই কাকের মুখ খুলে যায়, আর সে ডাকতে আরম্ভ করে। আবার শিকল ছেড়ে দিলে কাকের মুখ যেমন বন্ধ তেমনি বন্ধ। কাকগুলির আওয়াজ যাতে একরকম না হয় তাই অনেক কষ্ট করে নানা আকারের দাঁড়কাক

জোগাড় করতে হয়েছে। এই দাঁড়মোনিয়াম নিয়ে ছোটখাট গৎটত বেশ বাজানো যায়। সেদিন ভোরে কুট্টিমামা এই দাঁড়মোনিয়ামে একটা সুন্দর ভৈরবী বাজাচ্ছিলেন।" [চিরকালের সেরা ঃ সুনির্মল বসু, পৃ: ১১১-১১২] এরপর কুট্টিমামা একে একে আবিষ্কার করলেন দাদামশায়ের হুঁকো দিয়ে আলবোলার সবাক সংস্করণ 'তালবোলা', এ্যালার্ম ঘড়ি দিয়ে 'চোরধরা কল' প্রভৃতি। এমন আশ্চর্যজনক মজার বিষয়ের পরিকল্পনায় রচনাটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। বিজ্ঞানের এমন হাস্যকর কাল্পনিক প্রয়োগ সুনির্মলের অনন্য প্রতিভার পরিচায়ক।

'কুট্টিমামার আবিষ্কার'-এর মতোই 'অসম্ভব দুনিয়ায়' রচনাটিরও মূল আকর্ষণ কল্পবিজ্ঞান। 'অসম্ভব দুনিয়ায়' আঙ্গিক-প্রকরণে, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে একটি পরিপূর্ণ কিশোর-উপযোগী কাহিনিমূলক রচনা। আজগুবি অথচ সম্ভাব্য নানা ঘটনার ঘনঘটায় রচনাটি চমৎকার আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কাহিনির প্রথমাংশে জানা যায়, মেঘনায় নৌকাডুবিতে পঙ্কজ নামে এক ২০ বছরের যুবক তার আপনজনদের হারিয়েছে। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে সে। আশ্রয় পেয়েছে এক সন্ন্যাসীর নির্জন গুহায়। সন্ন্যাসী তাকে দিয়েছে ক্লান্তিনাশক ঘুমের ওষুধের গুঁড়ো। কিন্তু সেই ওষুধের পরিমাণ বেশি হওয়ায় পঙ্কজ নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ৫০০ বছর। তাই যখন তার ঘুম ভাঙে, তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে এক সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবীতে। এই ৫০০ বছর পরের পৃথিবীর ছবি আঁকতে গিয়ে সুনির্মল যে দূরদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা এককথায় অসাধারণ। এই পৃথিবীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, এখানে মানুষ লোহার ডানায় ভর দিয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়, খাবার ও পানীয়রূপে পান করে 'খিদ্দুর' নামে এক বিশেষ তরল, আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে 'ধুম্বিষ' নামক এক অত্যাধুনিক অস্ত্র। এ পৃথিবীতে সূর্যের কিরণ থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শক্তি সংগ্রহ করে তার সাহায্যে কলকারখানা চালানো হয়, রাতেও দিনের আলো জ্বালানো হয়। কল্পবিজ্ঞানের এমন আকর্ষণীয় উপস্থাপন সহজেই ছোটদের মন জয় করে। আবার লোহার ডানা লাগিয়ে পাঁচ'শ বছর পরের নতুন পৃথিবীর বুকে উড়ে বেড়ানোর সময় পঙ্কজের জবানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন সুনির্মল, তা-ও অসাধারণ। মনে পড়ে যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' গল্পের ছোট্ট রিদয়ের খোঁড়া হাসের পিঠে চড়ে বাংলাদেশের নানান মনোহারী রূপ-সৌন্দর্য দেখার দৃশ্যটি। তেমনি বর্ণনার বিশদতা রয়েছে সুনির্মলের রচনায়। তবে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতা অনেক বেশি গভীরতা ও একাত্মতা লাভ করেছে অবনীন্দ্রনাথের শৈল্পিক তুলিতে। অবশ্য এখানে সৌরশক্তির যে বিপুল প্রয়োগের কথা সুনির্মল উল্লেখ করেছেন, আজকের আধুনিক পৃথিবীতে আমরা তার প্রযুক্তিগত ব্যবহার প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। ফলে কাল্পনিক হলেও সম্ভাব্যতার ছোঁয়ায় রচনাটি বিশ্বস্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিশোর পাঠকদের মনকে কৌতূহলী ও আকৃষ্ট করার মতো যথেষ্ট উপাদান রয়েছে এ গ্রন্থে।

কবি-ছড়াকাররূপে সুনির্মল বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত। প্রচুর ভালো ভালো ছড়া কবিতা লিখেছেন তিনি। তাঁর কাব্যভাব, ছন্দবোধ ও রসচেতনা ছিল অসাধারণ। তাঁর কবিতাগুলিতে একইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বাস্তবসচেতনতা, সমাজচিন্তা আর হাস্য-পরিহাসের নির্মল আনন্দ। হাসি-মজার পরিবেশ

সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'চন্দ্রভায়ার পদ্মাপার', 'লঙ্কা-দহন পালা', 'কিন্তু যদি কামড়াত?', 'রামায়ণে নেই', 'রঘুবীর বেহারা', 'ইস্!', 'মামায়ণ', 'কী ভুল' প্রভৃতি কবিতাগুলি সহজেই ছোটদের মন জয় করে। শব্দ, ছন্দ, ভাব আর ভাষার অপূর্ব সামঞ্জস্য বড়দেরও মুগ্ধ করে। এছাড়াও সুনির্মলের অধিকাংশ কবিতায় রয়েছে নিটোল গল্পরস আর স্থানে স্থানে অসাধারণ নাটকীয়তা। যেমন, 'কিন্তু যদি কামড়াত?' কবিতায় দেখা যায়, বর্ষাকালে সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে বাড়ি ফেরার সময় পায়ে সাপ কামড়েছে ভেবে কিশোর মানিকলাল চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির লোকজন। চারদিকে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। এমন সময় বৈদ্যমামা এসে উদ্ধার করলেন —

"..... কোথায় সাপের কামড়? আচ্ছা বোকা মানিকটা,
এই দেখো না আটকে আছে শিমুল-কাঁটা খানিকটা!" [ঐ, পৃ: ১০]

আবার 'রামায়ণে নেই' কবিতায় কবি সরস ভাবে ও ভাষায় বর্ণনা করেছেন গায়ক রাবণ রাজার সুর ছেড়ে অসুর হয়ে ওঠার করুণ কাহিনি, যা কিনা রামায়ণে কোথাও নেই। 'মামায়ণ' কবিতার মূল বিষয়বস্তুও বেশ মজার। যদু আর মধু দুই বন্ধু। নিজের নিজের মামার তারিফ করতেই তারা ব্যস্ত। যদু তার বীর পালোয়ান মামার সম্পর্কে জানায়,

"সার্কাসেতে দুইহাতে সে চারটি মোটর থামিয়ে রাখে,
দৃশ্য দেখে বিস্ময়েতে তারিফ করে সবাই তাকে।"

মধুও দমবার পাত্র নয়। এর প্রত্যুত্তরে সে বলে,

"..... আমার মামা, কলকাতাতে ট্রাফিক পুলিশ!
দুইটি হাতে চারটি মোটর থামায় শুধু তোর সে মামায়,
আমার মামা একটি হাতে চলতি হাজার মোটর থামায়।" [ঐ, পৃ: ২২]

যদু মধুর পারস্পরিক 'মামায়ণ' কাহিনির আইডিয়াটি অভিনব ও অসাধারণ। এমন হাসি-মজার কবিতা অনেক লিখেছেন সুনির্মল। তবে শুধু হাসির খোরাক নয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ছোটদের সচেতন ও শ্রদ্ধান্বিত করে তোলার মতো উচ্চাঙ্গের কবিতাও লিখেছেন তিনি। এই জগতে আকাশ, বাতাস, পাহাড়, নদী, ফুল, পাখি তথা ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক। এদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে, জানার আছে। প্রকৃতির পাঠশালায় আমরা সবাই ছাত্র—এই গূঢ় তথ্যটি 'সবার আমি ছাত্র' কবিতায় ছোটদের কাছে সহজভাবে প্রকাশ করেছেন সুনির্মল,

"আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
.....

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।" [ঐ, পৃ: ১৮]

সমস্ত বাংলা সাহিত্যে এমন উচ্চ ভাবনার কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। কবিতাটির ভাবগাম্ভীর্য ও আবেদন কোনদিনই ম্লান হবার নয়। আবার 'সাঁওতাল বস্তিতে' কবিতাটি মানবিকরসে সমৃদ্ধ। এই কবিতার মধ্য দিয়ে অনার্য সাঁওতাল জাতির অকৃত্রিম জীবনাচরণের কথা ব্যক্ত করেছেন সুনির্মল। এখানে সভ্যসমাজ থেকে দূরে 'পাহাড় ঘেরা জংলা গাঁয়ে' সাঁওতালদের জীবনযাপনের নানা অজানা দিকগুলি সম্পর্কে কবি যেমন ছোটদের কৌতূহলী করে তুলেছেন, তেমনি সেইসব মানুষের প্রতি ছোটদের সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কবি বলেছেন—

"আসবি কি তুই আমার সাথে সাঁওতালদের বস্তিতে?
আয় তা হলে, কিন্তু আমায় পারবি না ভাই দোষ দিতে।
বন-নিরালায় পাহাড়তলায় সাঁওতালদের আস্তানা,
উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ, পিচ-ঢালা সে রাস্তা না।
নাই সেখানে অট্টালিকা, বিজলিবাতি জ্বলজ্বলে
জংলা পথে সাঁঝসকালে পাহাড়িদের দল চলে।
ভদ্রলোকে যায় না সেথা, যায় না সেথা সভ্য যে,
নয়ন-মনের চটকদারি নাইকো কোনো দ্রব্য যে।
জংলা গাঁয়ে জংলি থাকে পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলে,
আমার মত জংলি যারা তাদের হেথায় মন চলে।" [সুনির্মল রচনাসম্ভার, পৃ: ৫৫]

এমনই ভাবে ছোটদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি তাদের নৈতিক চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রেও সুনির্মল গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন।

প্রকৃতিও বারবার বিচিত্ররূপে ধরা দিয়েছে সুনির্মলের কবিতায়। 'ঝিরঝিরে হাওয়া', 'ঝড়ের রাত', 'বাদল-মাদল', 'বৈশাখী ভোর', 'শীতের সাঁঝে', 'ফাগুন-রাণী' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপশোভা। তার প্রাণময় উপস্থিতি। যেমন, 'বৈশাখী ভোর' কবিতায় দেখা যায়, বৈশাখের চির-নতুন প্রভাতের আগমনে কবিমন উচ্ছল —

"আজ নতুনের স্বাদটি পেয়ে আনন্দে মন উঠছে গেয়ে;
বৈশাখী ভোর আজকে আমার মন ভুলালো রে।" [বরণডালা, পৃ: ৩৮]

অন্যদিকে 'বাদল-মাদল' কবিতায় কবি যেন বাদল দিনের নিজস্ব সুরময় ছন্দময় অভিব্যক্তিটিকে মাদলের দ্রুতলয়ের ছন্দে পরিবেশন করেছেন। ছোটরা ধ্বনির মাধুর্য আর ছন্দের দোলা বেশি পছন্দ করে।

সেকথা মনে রেখেই বর্ষার রূপচিত্র এঁকেছেন সুনির্মল—

"এল ঝড় বাদল ধর মাদল গান বাজা
ধর তান বাঁশির গ্রামবাসীর প্রাণ তাজা।
(মাদল — ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা)

.....

এল বাদলা ঘোর পাগলা তোর কোনরে কাজ
ওই সুর শুরু ঝুরু ঝুরু শোনরে আজ।"
(মাদল — ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা)

[চিরকালের সেরা ঃ সুনির্মল বসু, পৃঃ ১৫]

এছাড়াও এই পর্বের শিশু-কিশোর সাহিত্য যাঁদের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তাঁদের নাম ও কিছু বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মের উল্লেখ করা হ'ল ঃ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) — 'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০১), 'ডমরু চরিত' (১৯২৩) প্রভৃতি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১) — 'সাত ভাই চম্পা' (১৯১০), 'টাক ডুমাডুম ডুম' (১৯১০) প্রভৃতি।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) — 'গল্পসল্প' (১৮৮৯)।

জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) — 'গ্রহ নক্ষত্র' (১৯১৫), 'পোকা-মাকড়' (১৯১৯), 'গাছপালা' (১৯২১), 'বাংলার পাখি' (১৯২৪) প্রভৃতি।

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮৪-?) — 'সাতরাজ্যের গল্প' (১৯২৮), 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' (১৯৩৬) প্রভৃতি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) — 'লালকুঠি' (১৯২৯), 'চালিয়াৎ চন্দর' (১৯৩৪) প্রভৃতি।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) — 'জাপানী ফানুস' (১৯১০), 'ঝুমঝুমি' (১৯২০) প্রভৃতি।

সুবিনয় রায়চৌধুরী (১৮৯০-১৯৪৫) — 'খেয়াল' (১৯৩৪), 'আজব বই' (১৯৩৫) প্রভৃতি।

জসীমউদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬) — 'এক পয়সার বাঁশী' (১৯৪৮) প্রভৃতি।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৪-১৯৩৯) — 'পদ্মরাগ' (১৯৩০), 'চায়ের ধোঁয়া ' (১৯৩০), 'সোনার হরিণ' (১৯৩৬) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৫-১৯৭৮) — 'বলি ত হাসব না' (১৯৩৯), 'হাল্কা হাসির খাতা' (১৯৩৯) প্রভৃতি।

বন্দে আলি মিয়া (১৯০৮-১৯৭৯) — 'মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা' (১৯৩৭), 'জঙ্গলের রাজা' (১৯৩৭) প্রভৃতি।

সুকুমার দে সরকার (১৯১০) — 'হানাবাড়ি' (১৯৩৬), 'দুই খুনী' (১৯৩৮) প্রভৃতি।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬) — 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে' (১৯৪১), শঙ্কর (প্রথম-দ্বিতীয় ভাগ ঃ ১৯৪২) প্রভৃতি।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রারম্ভিক লগ্ন থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সাহিত্যের বিশাল সম্ভারের একটা পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। বলাই বাহুল্য, যে সাহিত্যগুলি বিশেষভাবে ছোটদেব মনকে আকর্ষণ করে থাকে এবং তাদের চিন্তা ও চেতনার বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে সেগুলির আলোচনাই বিস্তৃত করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। সাহিত্যে ছোটগল্প। কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৩, ১৪।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। শিশু-সাহিত্যের পূর্ব্বক্ষণ ১। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। কলকাতা ঃ ডি. এম. লাইব্রেরী। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৯।

৪। সেন, সুকুমার। সাহিত্যে শিশু, শিশুর সাহিত্য। গল্পের গাঁটছড়া। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, ২০ মে ১৯৯৯। পৃ: ২৮-৩০।

৫। মজুমদার, মানস। রূপকথার রূপান্তর। সাহিত্য পত্রিকা জোয়ার। ১৫শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, শারদ ১৩৯১ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৮।

৬। ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। ভূমিকা ঃ খুকুমণির ছড়া (যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত)। কলকাতা ঃ সিটি বুক সোসাইটি। ১৬শ সংস্করণ ঃ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। পৃ: ১০।

৭। দত্ত, ইতিমা। ছড়া, লোকসাহিত্য, শিশুসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য ও শিশুচরিত্র। কলকাতা ঃ জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ। ১৯৮৬। পৃ: ৩।

৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছেলেভুলানো ছড়া ১ ঃ লোকসাহিত্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রবন্ধ। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯০৭। পৃ: ১৪৮।

৯। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। ঊনবিংশ শতাব্দী ঃ পত্রিকা প্রসঙ্গ। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০)।কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৫৮। পৃ: ৪।

১০। মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ। 'শিশুশিক্ষা'র দেড়শো বছর। মাসিক আলোচনাপত্র বাংলা বই ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ৬০ ঃ ডিসেম্বর ২০০৩। পৃ: ২ ।

১১। ঘোষ, বিনয়। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (৩ খণ্ড একত্রে)। নয়াদিল্লী ঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড। ১৯৭৩। পৃ: ৪০২।

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'শিক্ষারম্ভ' - জীবনস্মৃতি। কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ। পৃ: ১১।

১৩। ন্যায়রত্ন, রামগতি। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। সম্পাদনা ঃ ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ঃ সুপ্রীম বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স। নতুন সংস্করণ ১৯৯১। পৃ: ২১০।

১৪। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০)। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। আকাদেমি সংস্করণ ঃ ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯। পৃ: ৭১।

১৫। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। বাঙলা-সাহিত্যের একদিক। কলকাতা ঃ ৯৮/৪ রসা রোড, কালীঘাট। দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৫৫ সন। পৃ: ৬৪।

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। কলকাতা ঃ মডার্ন বুক এজেন্সী। দশম পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯০। পৃ: ৩০৬।

১৭। মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন। ভূমিকা ঃ ক্রীলফের নীতিগল্প। কলকাতা। ১৮৭০। পৃ: ৫-৮।

১৮। সেন, সুকুমার। সাহিত্যে শিশু, শিশুর সাহিত্য। গল্পের গাঁটছড়া। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। প্রথম আকাদেমি সংস্করণ, ২০ মে ১৯৯৯। পৃ: ৪৩।

১৯। 'মুকুট' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ/১৯০৮)। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। এর আখ্যা পত্রে লেখা ছিল ঃ 'বোলপুর ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে ''বালক'' পত্রে প্রকাশিত ''মুকুট'' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।'

২০। সম্পাদকমণ্ডলী। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২০০১, পৃ: ১২৬১।

২১। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৪ কার্তিক, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৪।

২২। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯ কার্তিক, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৪।

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২০০১। পৃ: ২০১।

২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কবিতা। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অগ্রহায়ণ ১৩৯০, নভেম্বর ১৯৮৩। পৃ: ৪৮৯।

২৫। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র শিশু-সাহিত্য পরিক্রমা। কলকাতা ঃ নবারুণ প্রকাশনী। ১৯৬১, পৃ: ২০৪।

২৬। দত্ত, ইতিমা। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য ও শিশুচরিত্র। কলকাতা ঃ জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ। ১৯৮৬। পৃ: ১৮০।

২৭। মজুমদার, লীলা। জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। অনুবাদক ঃ সৈয়দ কওসর জামাল। নয়াদিল্লী ঃ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। মূলগ্রন্থ ১৯৮৬, অনুবাদ ১৯৯৩। পৃ: ৫০।

২৮। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। টুনটুনির বই। কলকাতা ঃ শিশুসাহিত্য আকাদেমি। কলকাতা বইমেলা সংস্করণ, ২০০১।

২৯। চক্রবর্তী, পুণ্যলতা। ছেলেবেলার দিনগুলি। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃ: ৮৫।

৩০। বসু, বুদ্ধদেব। রামায়ণ। প্রবন্ধ সংকলন। কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ মাঘ ১৩৮৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২। পৃ: ১৪৩।

৩১। ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। ভূমিকা ঃ খুকুমণির ছড়া (যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত)। কলকাতা ঃ সিটি বুক সোসাইটি। ১৬শ সংস্করণ। ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। পৃ: ৩।

৩২। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। চিরকালের সেরা ঃ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। কলকাতা ঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০০০, পৃ: এগারো।

৩৩। সোনায় মোড়া শিশু-সাহিত্য। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে 'ভূমিকা' অংশ থেকে উদ্ধৃত। কলকাতা ঃ ছোটদের কচিপাতা। প্রথম কচিপাতা সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯। পৃ: ২।

৩৪। ঠাকুর, অমিতেন্দ্রনাথ। ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নতুন দিল্লী ঃ সাহিত্য আকাদেমি। ১৯৯৯। পৃ: ৮।

৩৫। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০)। কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৫৮। পৃ: ১২৮।

৩৬। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। মনের কথা। আপন কথা। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রথম আনন্দ সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ জুন ২০০২। পৃ: ৫-৬।

৩৭। ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদক)। 'ভূমিকা' — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কিশোর রচনা সংগ্রহ। কলকাতা ঃ নির্মল বুক এজেন্সি। প্রথম নির্মল সংস্করণ ঃ ১৯৯৪।

৩৮। ঘোষ, প্রবীর। 'ভূমিকা'- দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড। কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। দক্ষিণারঞ্জন শতবার্ষিকী সংস্করণ ঃ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ। পৃ: ণ।

৩৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'ভূমিকা'-ঠাকুরমার ঝুলি, (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংকলিত)। কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। চত্বারিংশৎ সংস্করণ ঃ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃ: ১০-১১।

৪০। গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। নীলনদের দেশে। কলকাতা ঃ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

৪১। চক্রবর্তী, পুণ্যলতা। ছেলেবেলার দিনগুলি। কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃ: ২০।

৪২। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। ভূমিকা ঃ সুকুমার রচনাসংগ্রহ (সম্পাদিত)। কলকাতা ঃ সাক্ষরতা প্রকাশন। ১৯৭৬। পৃ: দুই।

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। 'ভূমিকা': চাঁদের পাহাড়। কলকাতা ঃ সিগনেট প্রেস। দ্বাত্রিংশত্তম সিগনেট সংস্করণ ঃ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। চাঁদের পাহাড়। প্রাগুক্ত। পৃ: ২৬।